বাংলাদেশের মহাতীর্থ

শ্রী শ্রী মেহার কালীবাড়ী



সংকলনে

শ্রী পরিতোষ দেব
শ্রী সূর্য নারায়ণ সাহা

বাংলাদেশের মহাতীর্থ

শ্রী শ্রী মেহার কালীবাড়ী

প্রকাশকাল :
২য় সংস্করণ
সিদ্ধ দিবস, পৌষ সংক্রান্তি ১৪১৬ বাংলা

প্রকাশক :
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
জনৈক মাতৃভক্ত

সংকলনে :
শ্রী পরিতোষ দেব
সাধারণ সম্পাদক, মেহার কালীবাড়ী
শ্রী সূর্য নারায়ণ সাহা
অধ্যাপক, কুমিল্লা

প্রচ্ছদ ও সহযোগীতায় :
শ্রী হরবন্ধু মজুমদার

অক্ষর বিন্যাস :
মিহির কুমার দেব

মুদ্রণে :
রনী প্রিন্টার্স
১২ ফোল্ডার স্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা
ফোন : ৯৫৫৩৮৩১

মূল্য :
এ বইখানির কোন মূল্য নির্ধারণ করা হয়নি।
তবে যদি কোন ভক্ত মায়ের বাড়ীর সংস্কার ও উন্নয়নের সহযোগিতা করেন তা সাদরে গৃহীত হবে।

উৎসর্গ

মায়ের মধুর পরশ পাবার জন্য,
মায়ের কোলে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য,
মায়ের ভূবন মোহিনী রূপ প্রত্যক্ষ করার জন্য,
যে সকল তান্ত্রিক সাধক যুগে যুগে সাধন তপস্যা করে গেছেন
সে সকল মাতৃসাধকদের আত্মার উর্দ্ধলোক প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হলো।

রাজা ও দন্ডী সংবাদ

আজ হতে প্রায় সাড়ে পাঁচশত বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশের ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত (অধুনা চাঁদপুর জিলা) মেহার পরগনার রাজা ছিলেন শ্রী জঁটাধর দাস। একদিন পুণ্যধাম কাঁশী থেকে একদন্ডী সন্ন্যাসী রাজদরবারে আগমন করেন এবং রাজাকে বলেন, "বঙ্গদেশের এক মদ্যপ ব্রাহ্মণ কাঁশিতে যেয়ে আজ ৬ মাস যাবত মদ, মাংস ভোজন করতঃ বীরাচার ব্রত পালন করে আসছে এবং তৎপর হতে আমাদের (আহার্য্য) সমস্ত দ্রব্য আমরা মাংসময় দেখতে থাকি। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য চন্দ্রনাথ তীর্থে - যাত্রার পথে আপনার রাজদরবারে আমার সাময়িক যাত্রা বিরতি।

রাজা জঁটাধর দাস দন্ডী সন্ন্যাসীর কথা শ্রবণ করলেন এবং বললেন, "তাঁর নাম কি?" সন্ন্যাসী বললেন, "সর্ব্বানন্দ"। রাজা বললেন, "কাঁশীতে বীরাচার ব্রত পালনকারী এ বঙ্গদেশীয় ঠাকুর আর কেহই নহেন, তিনিই মেহারের দশ মহাবিদ্যা সিদ্ধ ও বাকসিদ্ধ মহাপুরুষ তান্ত্রিকাচার্য্য— ঠাকুর সর্ব্বানন্দ দেব। তারপর রাজা সর্ব্বানন্দ দেবের সাত-জন্ম-ব্যাপী "রীমায়ের রাঙ্গাচরণ দর্শন প্রাপ্তির নিরলস সাধনা ও অষ্টম জনমে এই মেহারে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার আদ্যোপান্ত ঘটনাবলী-সন্ন্যাসীকে বর্ণনা করেন।

সন্ন্যাসীর নিকট ঠাকুর সর্ব্বানন্দ দেবের সাধন সম্বন্ধীয় রাজার বর্ণনাই এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। রাজা সন্ন্যাসীকে বললেন, "এই দশমহাবিদ্যা সিদ্ধ মহাসাধক সর্ব্বানন্দদেব আমার পরমগুরু।"



বাংলাদেশের মহাতীর্থ

শ্রী শ্রী মেহার কালীবাড়ী

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমান জিলার অন্তর্গত সুরধনী নদী অতি পবিত্র ও পুণ্যপ্রদায়িনী। পুণ্যপিয়াসী বহুভক্ত এ নদীতে স্নান, তর্পণ সহ বিভিন্ন শাস্ত্রীয় ক্রিয়াদি সম্পন্ন করত। নদীর তীরবর্তী পূর্বস্থলীর অন্তর্গত সিংহলদী গ্রাম। আজ হতে প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্বে এ সিংহলদী গ্রামে বাস করতেন দ্বিজকুলোদ্ভব এক মহাত্মা, নাম বাসুদেব ভট্টাচার্য্য। বাসুদেব ভট্টাচার্য্য ছিলেন একজন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। তিঁনি ছিলেন মহান মাতৃভক্ত ও শাক্ত। শ্রীমায়ের চিন্তা, শ্রীমায়ের ধ্যান, শ্রীমায়ের রাঙ্গাচরণ দর্শন প্রাপ্তির আকাঙ্খায় শরীর মন কেন্দ্রস্থ করে অহর্নিশি তন্ময় হয়ে থাকা ছিল মাতৃভক্ত বাসুদেবের নিরন্তর সাধনা, জন্মজন্মান্তর ব্যাপী সাধনা। বাসুদেবের এক পুত্র সন্তান ছিল, নাম শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য। আর তাঁদের ছিল এক ভৃত্য, নাম পূর্ণানন্দ। একদিন বাসুদেব ঠাকুর গঙ্গাতীরে বসে শ্রীমায়ের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র জপ করতে ছিলেন। এমন সময় পেলেন দৈববাণী-

"ভবিষ্যতি ভবদ্বংশে বঙ্গ মেহার সংজ্ঞকে।
স্থিরোভব দ্বিজশ্রেষ্ট ত্বং মাং কলয়সীচ্ছয়া॥"

হে দ্বিজশ্রেষ্ট! তুমি স্থির হও। বঙ্গদেশে মেহার নামক প্রদেশে তোমার বংশে কেহ সিদ্ধিলাভ করবে। কেননা তুমি অন্তরের সাথে আমাকে স্মরণ করছ। উক্ত দৈববাণী শ্রবণ পূর্বক বাসুদেব ঠাকুরের শরীর ও মনে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল। এক দিব্য আলোর ঝলকানিতে তিঁনি শরীর ও মনে অনুভব করলেন এক অচিন্ত্য শিহরণ,

দিব্য কম্পন। এ শিহরণ এবং কম্পন কোন জড় জাগতিক শিহরণ বা কম্পন নয়। এ শিহরণ হলো সে শিহরণ, যে শিহরণের অপরাজেয় শক্তির বলে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুন দর্শন করেছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণের বিশ্বরূপ, এ শিহরণ সে শিহরণ, যে শিহরণের অমিত তেজের বলে মহামুনি ব্যাসদেব রচনা করেন মহাভরত, ভাগবত, লিপিবদ্ধ করেন পুরাণ এবং চতুর্বেদ।

কথিত আছে মেহারের দাস বংশীয় এক রাজা তীর্থ উপলক্ষ্যে গঙ্গাতীরে গমন করেন, সেখানে বাসুদেব ঠাকুরের অপূর্ব মাতৃভক্তি দর্শন করে প্রীত হন এবং প্রণাম নিবেদন পূর্বক দ্বিজশ্রেষ্ঠ বাসুদেব ঠাকুরকে গুরুপদে বরণ করার মনোবাসনা ব্যক্ত করেন। একেত দৈববাণী, তদুপরী রাজগুরুরূপে বাসুদেব ঠাকুরকে বরণ করার জন্য মেহারের দাস রাজার ঐকান্তিক আকাঙ্খা, এ দুয়েতে মিলে বাসুদেব ঠাকুরের জন্মজন্মান্তর ব্যাপী সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য এনে দিল এক মাহেন্দ্র যোগ।

তাই বাসুদেব ঠাকুর উক্ত দৈববাণী প্রাপ্ত হবার পর কাল বিলম্ব না করে বঙ্গদেশের ত্রিপুরা জেলান্তর্গত (অধুনা চাঁদপুর জেলা) মেহার প্রদেশের দাসরাজ কর্তৃক রাজগুরুরূপে আরাধিত হয়ে রাঢ়দেশ (পূর্বস্থলী) ত্যাগ করে সপরিবারে প্রিয়ভৃত্য পূর্ণানন্দ সহ মেহারে আগমন করেন।

তৎকালে দাস বংশীয় রাজগণ মেহার পরগনা শাসন করতেন। এই দাস বংশীয় রাজগণেরও পূর্ব নিবাস বর্দ্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর সিংহলদী গ্রামে। দাস বংশীয় রাজাদের মধ্যে সদানন্দ দাস প্রথমে পূর্ববাসস্থান ত্যাগ করে ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, জ্যোতির্বিদ, নাপিত, ধোপা, মালী সহ মেহার আগমন করে বসতি স্থাপন আরম্ভ করেন। মেহারের অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামে এই দাস বংশীয় রাজগন বসবাস করতেন। প্রকান্ড রাজবাড়ী, বাড়ীর পূর্বমুখী রাস্তা। বাড়ীর সামনে প্রকান্ড দীঘি। বাসুদেব ঠাকুর যখন মেহারে আগমন করেন, তখন মেহারের রাজা ছিলেন শিবানন্দ দাস। শিবানন্দ দাস ছিলেন একজন গুণগ্রাহী ও প্রতাপশালী রাজা। শাস্ত্রের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা। পন্ডিতে পণ্ডিতে যুক্তিতর্ক এবং শাস্ত্রের নানাবিধ আলোচনায় তাঁর রাজ দরবার থাকত নিত্য মুখরিত। বাসুদেব ঠাকুরের ব্রাহ্মণতেজপুঞ্জঃ সমন্বিত অবয়ব এবং বিনয় দেখে রাজা শিবানন্দ দাস খুবই সন্তুষ্ট হলেন। নিজমেহার গ্রামে প্রশস্ত নিষ্কর ভূমিতে বাসস্থান নির্মাণ করে তা স্বীয়-গুরুদেব বাসুদেব ঠাকুরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে দান করেন। রাজা গুরুদেবকে প্রচুর অর্থও দান করেন। বাসুদেব ঠাকুর রাজগুরু রূপে উক্ত বাড়ীতে পরিবার পরিজনসহ বসবাস আরম্ভ করেন।

অদ্যাবধি বাসুদেব ঠাকুরকে প্রদত্ত সে পুণ্যসলিলা বাড়ীটি বিদ্যমান এবং দেশে বিদেশে ইহা **"সর্ববিদ্যা বাড়ী"** নামে সুপরিচিতি লাভ করে আসছে। মেহারের এ সর্ববিদ্যা বাড়ীতেই "দশমহাবিদ্যাসিদ্ধ সাধক বাকসিদ্ধ মহাপুরুষ সর্বানন্দ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। সর্ববিদ্যাবাড়ীর ঠাকুরগণ বংশ-পরম্পরায় অদ্যপি রাজা শিবানন্দ দাস প্রদত্ত উক্ত নিষ্কর বসতিতে বাস করে আসছে।

নিত্যকর্ম, জপ, ধ্যান, শাস্ত্রালোচনা, পুজা, অর্চ্চনা করে বাসুদেব ঠাকুরের দিন ভালভাবেই অতিবাহিত হচ্ছিল। রাজা শিবানন্দ দাস বাসুদেব ঠাকুরের এহেন নিত্যকর্ম, ভাব, ভক্তি ও নিষ্ঠা দেখে খুবই আনন্দিত ও আত্মতৃপ্ত ছিলেন। কিন্তু বজ্রপাত তুল্য এক সংবাদ পেয়ে রাজা হতচকিত হয়ে যান। রাজা শুনলেন গুরুদেব মদ্যপায়ী। অমনি নরপতি গুরুদেবকে জিজ্ঞেস করলেন, "লোকে কানাকানি করছে, আপনি নাকি মদ পান করেন?" শিষ্যের প্রশ্ন শুনে গুরুদেব হেসে উঠলেন এবং বললেন, "যা পান করি, তা মদ নয়, ইহা সাধনার অঙ্গ। 'কারণ' তার নাম।"

গুরুদেবের কথা শুনে রাজা মৌন হলেন এবং লজ্জায় অধোমুখ হয়ে নিজকৃত কর্মের অনুশোচনা করতে করতে ফিরে আসলেন।

কিন্তু বিধির বিধান কে পারে খন্ডাতে? দিনে দিনে বাসুদেব ঠাকুরের প্রতি মানুষের নিন্দা, ভর্ৎসনা আরও বেড়ে গেল। সকলেই এক বাক্যে বলতে লাগল ঠাকুর বাসুদেব একজন মদ্যপ। লোকমুখে গুরুনিন্দা শ্রবণ করতে করতে গুরুর প্রতি রাজা শিবানন্দ দাসের অবিচল বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার বাঁধে ফাটল দেখা দিল। আর সে ফাটল দিয়ে নেমে এল গুরুর প্রতি অবিশ্বাস আর ঘৃণা।

তাই গুরুকে পুনরায় স্বচক্ষে পরীক্ষা করার জন্য একদিন নরপতি হঠাৎ গুরুগৃহে উপস্থিত হলেন এবং সবিষ্ময়ে অন্তরাল হতে প্রত্যক্ষ করলেন গুরুদেব মদমোহে মত্ত।

পূর্ণানন্দ নামে তাঁর এক ভৃত্য সুরাপানে সহায়তা করছে। এ অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে রাজা আক্রোশে ফেটে পড়লেন এবং মনে মনে ভাবলেন, জনশ্রুতি মিথ্যে নয়, জনশ্রুতি অভ্রান্ত। তাই রাজা গুরুদেবের কাছে যেয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "একি সুরা নয়?"

শিষ্য মুখে এ কথা শুনে গুরু বাসুদেব ঠাকুরের সাধন তেজ প্রজ্বলিত হয়ে উঠল এবং তিনি বললেন, -"ওহে মূঢ়! মন্ত্রদাতা গুরুর প্রতি এতো অবিশ্বাস। যদি আমি উপাসক হই-, এ পাত্রে সুরা নহে, প্রত্যক্ষ কর।" অমনি রাজা সবিষ্ময়ে দেখলেন, পাত্রে সুরা নেই। ইহা পয়ঃপূর্ণ পাত্র। লজ্জায়, ক্ষোভে রাজা হল শিহরিত। বায়ু ভগ্ন তরুর ন্যায় গুরুপদে আছড়িয়া পড়ল এবং কাতর স্বরে মিনতি করল–

"প্রভু ক্ষমা কর মোরে
রাখ তব রাঙ্গা পায়।"
কিন্তু
ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত আরম্ভিলা গুরু
যেন দীপ্ত দাবানল
"অবিশ্বাসী নৃপ! নাহি জানি ক্ষমা
ভুঞ্জ নিজ কর্মফল
মদে মত্ত আমি তোমার বিচারে

তবু নহি-জ্ঞান হারা
কিন্তু ধন মদে মত্ত হায় তুমি
সরাজ্ঞান কর ধরা।
দেখহ বিচারি এ দুয়ের মাঝে-
কে অধিক মদে মত্ত
হল বুদ্ধি নাশ ইষ্টে অবিশ্বাস
করি দিলে মনস্তাপ
ভুঞ্জ ভূপ! তবে তার প্রতিফল
দিনু এই অভিশাপ
প্রতীচ্য গগণে দেব দিনমণি
না হইতে অস্তগত,
কহিনু নিশ্চয় হবে আজি তব
পাপ মুন্ড দেহচ্যুত।"

বজ্রাহতের ন্যায় আহত নৃপতি উপায়ান্তর না পেয়ে গুরুপদ রেনু মস্তকে মেখে প্রাসাদে ফিরে গেলেন। গুরুর অভিশাপ, মুনির অভিশাপ অলঙ্ঘনীয়। অন্ধমুনির শাপে রাজা দশরথের হল প্রাণ বিয়োগ। মুনির অভিশাপে পরীক্ষিত রাজার হল প্রাণ বিসর্জন। ক্রমে বেলা অপরাহ্ন। নরপতি মৃত্যুর প্রহর গুনছেন। এমন সময় ঘটল এক দুর্ঘটনা। প্রকৃত পক্ষে দুর্ঘটনা নয়। বিধির বিধান।

রাজ বাড়ীর সামনে এক সুবৃহৎ সরোবরের খনন কাজ চলতে ছিল। মগ ও যবন জাতীয় দু'দলের অসংখ্য কোদালী উক্ত খনন কাজে নিয়োজিত ছিল। হঠাৎ খনন কার্যের সীমানা চিহ্নিত করা নিয়ে দু'দল কোদালীর মধ্যে শুরু হল তুমুল ঝগড়া বিবাদ। রাজার কাছে উভয় দল হল বিচার প্রার্থী। ইত্যবসরে রাজা গুরুপ্রদত্ত অভিশাপ ভুলে গেলেন এবং বিচার প্রার্থী দু'দলের সমস্যা মিটানোর উদ্দেশ্যে একাকী সরোবরে গমন করলেন এবং সীমানা চিহ্নিত করে প্রাসাদে ফিরবারকালে মীমাংসায় পরাজিত দলের কোদালের আঘাতে রাজার দেহ হতে মস্তক হল খন্ডিত। সত্য প্রমাণিত হল গুরুর অভিশাপ। মিথ্যা জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করে গুরুনিন্দা করার কারণে গুরুর অভিশাপে রাজা শিবানন্দ দাসের হল অকালে প্রাণ বিয়োগ। দাস রাজত্বে নেমে এলো শোকের ছায়া।

অসময়ে রাজার অকস্মাৎ প্রাণ বিয়োগ। এ যেন বজ্রাঘাতের চেয়ে আরও বেদনাদায়ক, আরও হৃদয়ভেদী। পতীশোকানলে দগ্ধীভূতা রানী গুরুর নিকট এসে রোদন করতে লাগল, বিলাপ করতে লাগল, সে নিঃসন্তান। দাস রাজবংশে বাতি দেবার আর কেহ রইল না। গুরুদেব তখন স্বহস্তে তৈরী মৃন্ময়ী শিবলিঙ্গের শিরে অবস্থিত বজ্রখানি (বর্তুলাকার ক্ষুদ্র মৃত্তিকা খন্ড) রানী মাতাকে প্রদান পূর্বক বললেন-

"ধ্যানযোগে জানতে পারলাম, তোমার গর্ভে কন্যা সন্তান। এ বজ্রখানি শ্রদ্ধা সহকারে উদরস্থকর। দেখবে তোমার এক সুলক্ষণ, গুনবান পুত্র সন্তান জন্ম হবে।

শিরে জটা থাকবে, নাম রেখো জটাধর। কিন্তু সাবধান! তব বংশে কেহ যেন আর শিবলিঙ্গ শিরের বস্ত্র ব্যবহার না করে।"

যথাসময়ে গুরুকৃপায় রাণী মাতা এক জটাধারী পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। নাম রাখলেন জটাধর দাস। জটাধর দাস ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হতে লাগল এবং অস্ত্র ও শাস্ত্র বিদ্যায় যথেষ্ট দক্ষতা ও পান্ডিত্য অর্জন করে নৃপতিদের মাঝে যশস্বী হয়ে উঠল।

অনেক দিন হয়ে গেল। বিপ্র বাসুদেবের প্রতি পুনঃ দৈববাণী হল " ভৃত্য পূর্ণানন্দ সহ তুমি কাঁমাক্ষ্যা মায়ের মন্দিরে গমন কর এবং ˚হ্রীমায়ের সাধনা কর।" ভৃত্য পূর্ণানন্দ সহ বাসুদেব ঠাকুর আসামের বিখ্যাত কামাখ্যা মন্দিরে এসে উপনীত হলেন। গৌহাটি শহরের অদূরে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে সুউচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত কাঁমাখ্যা মায়ের মন্দির। অতি মনোরম স্থান। সতীর দেহের ৫১টি টুকরো ভারতবর্ষের যে যে স্থানে পতিত হয়েছে, প্রতিটি স্থান পরিণত হয়েছে এক এক মহাতীর্থে। প্রতিটি স্থান পরিণত হয়েছে এক এক মাতৃপীঠে। কামাখ্যা মায়ের মন্দির এ ৫১ মাতৃপীঠের এক মহাপীঠ। এখানে সতীমাতার মহাযোনী অংশ পতিত হয়। মাঁ ভূবনেশ্বরী দেবী কাঁমাখ্যা মন্দির আলোকিত করে রেখেছেন। এ কাঁমাখ্যা মায়ের মন্দিরে বাসুদেব ঠাকুর অন্ন, জল, পত্র, ফল পরিত্যাগপূর্বক সদা জাগ্রত থেকে ˚হ্রীমায়ের জপ করার এক উৎকট সাধনা আরম্ভ করলেন। এ যেন দেবাদিদেব মহাদেবকে পতিরূপে পাবার জন্য পার্বতীর উৎকট সাধনা, এ যেন ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য মুনি বিশ্বামিত্রের উৎকট সাধনা। দেবী তুষ্ট হলেন। আবার দৈববাণী হল "তুমি উৎকট তপ পরিহার কর। কারণ এ জনমে তোমার মনষ্কামনা সিদ্ধ হবে না। পুত্রের ঔরশে পৌত্ররূপে বঙ্গদেশের অন্তর্গত মেহার নামক স্থানের জীন বৃক্ষমূলের সন্নিকটে পুরাকালে ভবানীদেবীর মন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত মাতঙ্গ মুনি যে **মতঙ্গেশ শিবলিঙ্গ** (কলিতে অপ্রকাশ্য) সংস্থাপন করেছেন, ঐ স্থানে অর্ধরাত্রে শবারোহনে মন্ত্র সাধনা করলেই সিদ্ধিলাভ হবে। প্রত্যক্ষা হব আমি।"

এ দৈববাণী পেয়ে বিপ্র বাসুদেব তা সবিস্তারে ভৃত্য পূর্ণানন্দকে অবগত করালেন। ˚হ্রীমায়ের দর্শন প্রাপ্তির জন্য জন্মজন্মান্তর ব্যাপি সাধনারত বাসুদেবের আর ক্ষণকাল বিলম্ব সহ্য হলো না। তিনি তৎক্ষনাৎ যোগবলে স্বীয় কলেবর ত্যাগ করেন এবং অচিরেই পুত্র শম্ভুনাথের ঔরশে পৌত্ররূপে মেহারে জন্ম গ্রহণ করেন। এ শিশুই পরিণত বয়সে পরিচিতি লাভ করেন বিশ্ববিখ্যাত তান্ত্রিকাচার্য্য ঠাকুর সর্ব্বানন্দ দেব হিসেবে। শম্ভুনাথ বাসুদেবের পুত্র। শম্ভুনাথের আরও ৩টি পুত্র সন্তান ছিল। নাম আগমাচার্য্য, গঙ্গাধর ও গদাধর। আগমাচার্য্য অগ্রজ, গঙ্গাধর ও গদাধর সর্ব্বানন্দের অনুজ। সর্ব্বানন্দ ক্রমে ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হতে লাগল। বাল্য হতে কৈশোরে, কৈশোর হতে যৌবনে পদার্পন।

সুন্দরকায়, সুন্দরমন, দয়াপরবশ, সরল, কুটিলতাহীন, সদাচিন্তামগ্ন, উদাসীন, নাই কোন অক্ষরজ্ঞান। পুত্রের এহেন অবস্থায় পিতা শম্ভুনাথ খুবই উদ্বিগ্ন। উদাসীনতা অপসারণ পূর্বক পুত্রকে সংসারমুখী করানোর অভিপ্রায়ে বল্লভা নাম্নী এক পরমা সুন্দরী যুবতীর সাথে পরিণয় বন্ধনে আবদ্ধ করালেন পুত্র সর্ব্বানন্দকে।

কিন্তু হায়! বিষ্ণু প্রিয়া কি পেরেছিল নিমাইকে গৃহকোণে আবদ্ধ রাখতে? সুন্দরী গোপা কি পেরেছিল সিদ্ধার্থকে তার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির সাধনা হতে ফেরাতে?

বল্লভাও পারেনি সর্ব্বানন্দকে গৃহকোণে আবদ্ধ রাখতে। এরই মধ্যে সর্ব্বানন্দের এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করল। নাম রাখা হলো শিবনাথ। পৌত্র দর্শনে শম্ভুনাথের আনন্দ আর ধরেনা। পুত্রের কারণে বিষাদ আর পৌত্রের কারণে হরষ। এ হরষ বিষাদের মধ্যদিয়ে শম্ভুনাথের দিন একরকম অতিবাহিত হচ্ছিল। এরই মাঝে একদিন শম্ভুনাথ হলেন স্বর্গবাসী। কালক্রমে শিবনাথ অত্যন্ত বিদ্যুৎসাহী ও প্রগাঢ় বুদ্ধি সম্পন্ন হলেন। অতি অল্পকালের মধ্যে নানা শাস্ত্রে শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে রাজসভায় পণ্ডিত মন্ডলীর মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ পন্ডিত বলে আদৃত হলেন। কিন্তু পিতৃদেবের মূর্খতা হেতু নীরবে অশ্রুপাত করতেন।

এদিকে পূর্ণানন্দ কাঁমাখ্যা ক্ষেত্রে বাসুদেবোক্ত সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে পুনঃ মেহার ফিরে আসলেন এবং শম্ভুনাথ তনয়দেরকে অত্যন্ত যত্নের সাথে লালন পালন করতে লাগলেন। আগমাচার্য্য ছিলেন দর্শন শাস্ত্রে শ্রেষ্ট পন্ডিত এবং দাস রাজসভার সভাপণ্ডিত।

১৪২৬ খৃষ্টাব্দের পৌষসংক্রান্তি, শুক্রবার অমাবস্যা তিথি।

এদিন হঠাৎ আগমাচার্য্য স্থানান্তরে এক পণ্ডিত সভায় নিমন্ত্রিত হয়ে বাড়ী হতে চলে যান। সভাপণ্ডিত আগমাচার্য্য নিত্যই রাজবাড়ী হতে রাজভোগ নিয়ে গৃহে ফিরতেন। আজ তিনি অনুপস্থিত। তাই রাজাকে আশীর্ব্বাদ করে সে রাজভোগ পাবার কোন উপায় নেই দেখে, নিরুপায় আগমাচার্য্য পত্নী সর্ব্বানন্দদেবকে সম্বোধন করে বললেন, "ঠাকুরপো, এখন রাজবাড়ী যেয়ে মহারাজকে আশীর্ব্বাদ জানিয়ে নিত্য দেব-সেবার প্রয়োজনীয় 'সিধা' (দৈনন্দিন পূজা ভোগের উপলক্ষ্যে গুরুর প্রতি রাজা কর্তৃক বরাদ্দকৃত সামগ্রী) নিয়ে আস।" ভ্রাতৃজায়ার আদেশে স্বভক্ত পূর্ণানন্দ সহ সর্ব্বানন্দদেব রাজপরিষদে গমন করলেন। তিনি রাজসভায় উপস্থিত হয়েছেন, এ সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে মহারাজ স্বয়ং সভার দ্বারদেশে গললগ্নীকৃতবাসে দন্ডায়মান হলেন। পশ্চাতে প্রহরী বিজয়সিংহ গুরুদেব উপস্থিত হওয়া মাত্র বিজয় ঘন্টা বাজিয়ে দিল। ঘন্টাধ্বনি শ্রবণমাত্র রাজা গুরুদেবের শ্রীচরণকমলে লুটিয়ে চরণধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করে আজ্ঞাবহ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। গুরুদেব পণ্ডিত সভার আসনে সমাসীন হলেন। বেদ-বেদান্ত, তন্ত্র-দর্শন, উপনিষদ ইত্যাদি বহু শাস্ত্রালোচনা আরম্ভ হল। কারো প্রতি জয়-ধ্বনি এবং কারো প্রতি পরাজয়-ধ্বনিতে রাজসভা মুখরিত হয়ে উঠল। ঠিক এমনই সময় উপস্থিত পণ্ডিতগণ ঘটালেন এক ঘটনা। বাস্তবিক পক্ষে মেহার রাজসভায় সভাপণ্ডিত রূপে আগমাচার্য্যকে তারা কোন মতেই সহ্য করতে পারছিলেন না। কিন্তু কিছুই করার উপায় নেই। কারণ আগমাচার্য্য ছিলেন মেহার রাজ কর্তৃক মনোনীত সভাপণ্ডিত। তদুপরি শাস্ত্রজ্ঞান এবং পাণ্ডিত্যে আগমাচার্য্যের সাথে পাল্লা দেবার মত সামর্থ্যবানও তখন কেহ ছিল না। কিন্তু আগমাচার্য্যের প্রতি ঈর্ষাভাব তাদের অন্তরকে সবসময় করত দগ্ধীভূত। তাই আগমাচার্য্যের অনুপস্থিতিতে তাঁর অনুজ সর্ব্বানন্দকে উক্ত দিনের জন্য সভাপণ্ডিত হিসেবে দেখে তাঁদের অন্তরে দীর্ঘদিনের চেপে রাখা ঈর্ষার অনল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। মেহার রাজসভার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ ভাবল আগমাচার্য্যের প্রতি প্রতিশোধ

নেবার এ এক চরম সুযোগ। এ সুযোগ কোন মতেই হাতছাড়া করা যাবে না। কারণ তাঁরা বেশ ভাল করেই জানত সর্ব্বানন্দ একজন মূর্খ। তাই রাজসভায় তাঁকে কোন্ প্রশ্নবাণে পরাজিত করা যায় এমন বলাবলির সময় একজন পণ্ডিত বললেন, মূর্খ সর্ব্বানন্দকে প্রশ্ন করা হবে, আজ কোন তিথি? রাজসভার কাজ সমাপনান্তে ঠাকুর সর্ব্বানন্দ গৃহে ফিরবার উদ্যোগ নেবেন, ঠিক এমন সময় পণ্ডিত মন্ডলী তাঁর পথ রুদ্ধ করে রাজার সামনে প্রশ্ন করল, "ঠাকুর, আজ কোন তিথি?" কিন্তু ঠাকুর সর্ব্বানন্দ সত্যই তিথি সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। নির্ভীকভাবে সর্ব্বানন্দ বললেন, "আজ পূর্ণিমা।" বাস্তবিক সেদিন ছিল পৌষ-সংক্রান্তির অমাবস্যা তিথি। তখন পণ্ডিতমন্ডলী অট্টহাসি হেসে বললেন, "ঠাকুর, তুমি রাজার গুরু-অথচ এমন মূর্খ! বাড়ী যেয়ে লেখা-পড়া শেখ। আজ পূর্ণিমা নয়, অমাবস্যা তিথি।" সজলনয়নে সর্ব্বানন্দদেব বাড়ী ফিরে ছল ছল চক্ষে আগমাচার্য্যদেবের পত্নীকে বললেন, "আমি আর রাজসভায় যাব না।" তিনি বললেন, "কি হয়েছে?"

উত্তরে সর্ব্বানন্দ বললেন, "আমি মূর্খ, লেখা-পড়া শিখি নাই ইত্যাদি"। কাছ থেকে বিস্তারিত শ্রবণের পর বাড়ীশুদ্ধ সকলে লজ্জায়, অপমানে ফেটে পড়ল। ভ্রাতা, জায়া, পুত্র- সকলের নিকট পুনঃপুনঃ তিরস্কৃত হতে লাগলেন সর্ব্বানন্দ। আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা সকলেই কর্কশ ভাষায় তাঁকে ভৎর্সনা করতে লাগল। গুরুপুত্র হয়ে শিষ্যের সামনে চরম অপমান, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, সর্বত্রই বিরুদ্ধাচরণ, সবখানেই প্রতিকূলতা, যেদিকে যাওয়া যায় সেদিকেই বাক্যবানের শরাঘাতে যেন রক্ত ঝরে। কথিত আছে সেদিন আহার করতে বসলে সর্ব্বানন্দের পাতে বড় ভাইয়ের নির্দেশে ভাতের সাথে ছাই দেয়া হয়েছিল। বাড়ীশুদ্ধ সকলের এ রূঢ় আচরণে সর্ব্বানন্দের শোচনীয় অবস্থা সহনীয় মাত্রাকে পূর্বেই অতিক্রম করেছে। দুচোখ হতে অবিরাম অশ্রুধারা বইতে লাগল। মনের সমস্ত চিন্তা, সমস্ত ধ্যান, সমস্ত অনুভূতি একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হল। মুর্খতা, মূর্খতা, মূর্খতা। সর্ব্বানন্দের মূর্খতাই তার এ পরিণামের জন্য দায়ী। তীরভেদা পাখী যেমন যন্ত্রণায় ছটফট করে, মাতৃহারা শিশু যেমন অসহায়ত্বে ছঁটফট করে, মূর্খতাও সর্ব্বানন্দকে পলে পলে করছে দগ্ধীভূত, ক্ষণে ক্ষণে করছে অপমানে জর্জরিত।

সর্ব্বানন্দ বিলাপ করতে লাগলেন-

কি ফল জগতে মূর্খের জীবনে
শান্তি-লেশ নাই অন্তরে যার।
লভে কি জনম জ্ঞানহীন জন
বাড়াতে কেবল ধরার ভার?
জ্ঞান দীপ সদা জ্বলে যার হৃদে
স্বর্গ-সুখে তার অদৃষ্টে হয়,
বন্যপশু আর বিদ্যাহীন নরে
অবয়বে মাত্র পার্থক্য রয় ॥

স্ত্রী পুত্র পরিজন দিলনা এতটুকু সান্তনা, এমনকি অর্ধাঙ্গিনী স্ত্রীও পাতে দিলনা অন্ন। এমন সময় সর্ব্বানন্দের মনে আত্মহননের ইচ্ছা জেগে উঠল। হঠাৎ বিবেক থেকে সারা এল-

"এহেন সকাম-মৃত্যুতে কি ফল
ত্যজ এ দুর্মতি পথিক বর
হও জ্ঞানবান শাস্ত্র অধ্যয়নে
কর প্রাণপন বচন ধর।"

এক দুর্বার প্রেরণা সর্ব্বানন্দের শুষ্ক হৃদয়কে সঞ্জীবিত করে তুলল। কালিদাসের মত জগমূর্খ যদি হতে পারে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাকবি এবং বিখ্যাত পণ্ডিত, সর্ব্বানন্দ কেন পারবেনা? অবশ্যই পারবে।

এযেন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। মূর্খতা দূর করতে হবেই। জ্ঞানালোকে আলোকিত হতে হবেই। যে কথা সে কাজ। লেখাপড়ার জন্য তালপত্র দরকার। তালপত্র অন্বেষণে সর্ব্বানন্দ গভীর বনে এক তালবৃক্ষের নীচে উপস্থিত হলেন। বৃক্ষারোহনে চিরঅনভ্যস্ত সর্ব্বানন্দ একটুও পিছু না হটে কঠিন প্রতিজ্ঞার দৃপ্ত তেজে তালবৃক্ষে আরোহন করতে লাগলেন এবং পাতার সম্মুখীন হতেই তিনি সবিষ্ময়ে দেখলেন বৃক্ষোপরি এক বিষধর সর্প, ফনা বিস্তার করে তাকে দংশন করতে উদ্যত। তদ্দর্শনে সর্ব্বানন্দ এতটুকু ভীত না হয়ে অসীম সাহসিকতায় ফনা বিস্তারকারী সর্পকে বজ্রমুষ্টিতে ধরে ফেললেন এবং তালপত্র শাখার তীক্ষ্ণ প্রান্ত ভাগ দ্বারা ঘর্ষণ করে উক্ত সাপের মস্তক ছেদন করে বৃক্ষের নীচে ফেলে দিলেন। এখানে উল্লেখ প্রয়োজন, শ্রীমায়ের রাঙ্গাচরণ দর্শনের সাধনা সর্ব্বানন্দের একজীবনের তপস্যা নয়। এ এক জন্মজন্মান্তরের সাধনা। মেহারে শম্ভুনাথের পুত্র হিসেবে জন্মগ্রহণ করার পূর্বে আরও সাত জন্ম ব্যাপী নিরলস তপস্যা ছিল সর্ব্বানন্দের শ্রীমায়ের চরণ দর্শনের জন্য। মেহারে এ অষ্টম জনমে সর্ব্বানন্দ হবেন সর্ব্বসিদ্ধ, বাক্‌সিদ্ধ, স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করবেন শ্রীমায়ের রাঙ্গা চরণ।

প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বানন্দ দেবের প্রতি বিশ্বজননী মায়ের ছিল অকুণ্ঠ স্নেহ এবং আন্তরিক আকর্ষণ। স্বয়ং পার্বতী মাতা ঐ বিশেষ দিনে মহাদেবকে বললেন,

"এ আদেশ শিরোধার্য্য তব
মহেশ্বর! যদি অদ্য নিশার্দ্ধ সময়
আশ্রমের জীনমূলে আরোহিয়া শব,
মন্ত্রের সাধনা করে হইয়া তন্ময় ॥
সর্ব্বানন্দ-হবে সিদ্ধ; পূর্ণানন্দ নামে
ভক্ত অন্যতম মম, আছে দেব তথা
ভৃত্যরূপে; মমবরে আত্মপ্রাণদানে
হবে সে সহায় তার; কদাচ অন্যথা
না হবে; স্বরূপে দোহে দিয়ে দরশন
ঘুচাইবে উভয়ের সংসারবন্ধন।" (নগেন্দ্র রায় চৌধুরী রচিত অপূর্ব্ব-সাধনা)

তালবৃক্ষ হতে সর্ব্বানন্দ দেখলেন বৃক্ষমূলে গেরুয়া পোশাকে পরিব্রাজক বেশধারী জটাজালমণ্ডিত এক দীর্ঘাঙ্গী সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান। হাতে ত্রিশুল এবং কমন্ডুলু। এ সন্ন্যাসী আর কেহই নহেন। তিনিই হচ্ছেন সর্ব্বানন্দের পূর্ব্ব জন্মার্জিত (সাতজন্ম) তপস্যার ফল প্রদাতা দেবাদিদেব স্বয়ং **মহাদেব**।

সন্ন্যাসী সর্ব্বানন্দকে বললেন, "তুমি কে? কেন বৃক্ষে আরোহন করছ? বৃক্ষ হতে নেমে এসো। আমি তোমার মনস্কামনা পূরণ করব।"

উত্তরে সর্ব্বানন্দ বললেন, "আমি অতি মূর্খ। আমি আজ রাজসভায় অমাবস্যা তিথিকে পূর্ণিমা বলেছি। এ মূর্খতার কারণে ভ্রাতা, জায়া, পুত্রের নিকট চরম অপমানিত হয়েছি। আমি জ্ঞানার্জন করার জন্য তালপত্র সংগ্রহ করতে বৃক্ষে আরোহন করেছি।"

ভক্তবৎসল সন্ন্যাসী বেশধারী মহাদেব সর্ব্বানন্দকে বললেন- "আমি তোমাকে সর্ব্বসিদ্ধি মন্ত্র প্রদান করব। আর লেখাপড়ার দরকার নেই। সর্ব্বসিদ্ধি মন্ত্রেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।" সর্ব্বানন্দ বললেন, "আমি সর্বসিদ্ধি মন্ত্র চাইনা। আমি চাই লেখা-পড়ার মাধ্যমে বিদ্যার্জন এবং জ্ঞানার্জন।"

তখন এক অলৌকিক কান্ড ঘটল। সন্ন্যাসী ত্রিশূল দ্বারা ভূমিতে পড়ে থাকা সর্পের ছিন্ন মস্তক অবশিষ্ট দেহে সংযোজন করে কমন্ডুলু হতে মন্ত্রপুতঃ বারি তদোপরি নিক্ষেপ করার সাথে সাথেই সর্প ফনা তুলে বনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এ অপরূপ অলৌকিক দৃশ্য দেখে সর্ব্বানন্দ বিস্মিত হলেন এবং বৃক্ষ হতে অবরোহন করে সন্ন্যাসীকে প্রণাম পূর্বক বিনীতভাবে বলতে লাগলেন, "আমি আপনার মন্ত্র শক্তিতে বিশ্বাস না করে মহাপাপ করেছি। আমাকে ক্ষমা করুন। মৃতসর্পে জীবন দানে যে অলৌকিকত্ব দেখালেন, তা সাধারণ নয়। অসাধারণ, অতি অসাধারণ। যে মন্ত্র মৃতে জীবন দিতে পারে, তা আমার মত মূর্খরূপ মৃতেও জীবনসঞ্চার করতে পারবে। আপনি কে? আমায় আপনি শিষ্যত্বে বরণ করুন।" সন্ন্যাসী বললেন, "তুমি বড় ধন্য। তুমি বড় সার্থক। সার্থক জন্ম তোমার। মৃত্যুকে তৃনবৎ মনে কর তুমি॥ তুমি হবে সাধনায় সিদ্ধ। তোমাকে শিষ্যরূপে পেয়ে আমি মহাদেব হব ধন্য।"

তারপর দেবাদিদেব মহাদেবের নির্দেশে সর্ব্বানন্দ পার্শ্ববর্তী সরোবরে অবগাহন করে মহাদেবকে প্রণতি নিবেদন করে করজোড়ে তাঁর সামনে উপবেশন করলেন। তখন মহাদেব সর্ব্বানন্দের কর্ণে সর্বসিদ্ধি প্রদায়িনী সর্বসিদ্ধি মন্ত্র প্রদান করলেন এবং তাঁকে শিষ্যত্বে বরণ করলেন।

ধন্য মেহার। ধন্য বঙ্গদেশ। এ মেহারে এসেছিলেন দেবাদিদেব মহাদেব। মহাদেবের পুণ্যপদস্পর্শে মেহারের মাটি থাকবে চির পুণ্যময়। যদিও প্রায় ৬০০ বৎসর পুর্বেকার সে সর্বসিদ্ধিমন্ত্র অদ্যাবধি ধারাবাহিকতায় কেউ ধরে রাখতে পারেনি। তথাপি মেহারের আকাশে বাতাসে বৃক্ষে ও বনরাজিতে তা মিশে আছে অনুক্ষণ। উৎসুক ভক্তবৃন্দের দেহমনে সর্বক্ষণ অনুরনন জাগাবে সে মন্ত্র। যেমন করে সাড়ে পাঁচহাজার

বৎসর পূর্বের কৃষ্ণের বাঁশীর সুর অদ্যাবধি অনুরনন জাগায় বৃন্দাবন পিয়াসীদের দেহ ও মনে। সর্ব্বানন্দ বলল "গুরুদেব, সর্বসিদ্ধি মন্ত্র পেলাম। সাধনরীতি শিখিয়ে দিন।"

মহাদেব বললেন, "পুরাকালে মেহারে ছিল মাতঙ্গ আশ্রম। সেখানে জীনবৃক্ষমূলে দেবী ভবানীমায়ের মন্ত্র সিদ্ধির নিমিত্ত মাতঙ্গ মুনি স্থাপন করেন **'মতঙ্গেশ শিব লিঙ্গ'**। মতঙ্গেশ শিবলিঙ্গ কলিতে অপ্রকাশ্য (পাতালগামী)। অদ্য সে জীনবৃক্ষ মূলে উক্ত শিবলিঙ্গস্থিত স্থানে শবাসনে উপবিষ্ট হয়ে অর্দ্ধনিশাযোগে এ মহামন্ত্র জপ করলে ভূবন-ঈশ্বরী দেবী তোমার সম্মুখে দিবেন দরশন। পূর্ণ হবে মনস্কাম।" এ কথা বলে দেবাদিদেব মহাদেব হলেন অন্তর্ধ্যান।

জন্মজন্মান্তর ব্যাপী কঠোর সাধানায়রত পূণ্যাত্মা সর্ব্বানন্দ সর্বসিদ্ধি মন্ত্র লাভ করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। সে আনন্দের বর্ণনা দুঃসাধ্য। তাঁর সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় যেন এক অজানা পুলকে শিহরিত হল। এক জন্ম নয়, দু'জন্ম নয়। দীর্ঘ সাত জনমের নিরলস সাধনায় সিদ্ধ হওয়ার মাহেন্দ্রক্ষণ সমাগত। এ যেন লক্ষ লক্ষ মাইল পারি দিয়ে অবশেষে তীরে ভীড়ল তরী। আজ মনে পড়ে সমস্ত কথা, মনে পড়ে একেক জনমের একেক সাধন সংযমের কথা, কৃচ্ছতার কথা, মনে পড়ে নীল গিরীর কথা, শৈলের কথা, সিন্ধু নদ তীরের কথা, বদ্রিকাশ্রমের কথা, গঙ্গাসাগরের কথা। মনে পড়ে কাশীধাম ও কাঁমাক্ষ্যা মন্দিরের কথা। বহুযুগ পূর্বে সর্ব্বানন্দ যখন নীলগিরিতে তপস্যারত ছিলেন, তখন পুরীতে শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের কোন মন্দির ছিল না। অচল পাহাড় বেষ্টিত নীল সমুদ্র, রাত্র দ্বিতীয় প্রহর। সর্ব্বানন্দ সাধনায় মগ্ন, দৈববাণী শুনলেন, "কাল প্রাতে সমুদ্রতীরে একটি পবিত্র স্থান খুঁজে বের করতে হবে। শ্বেত অশ্বের লোম ও অশ্ব সদ চিহ্ন ঐ স্থানের নিশানা। সেখানে বালি খুড়ে দেখা যাবে একটি মঠের চূড়া। ঐ মঠেই বর্তমান আছেন নীল মাধবের মূর্তি। নির্দিষ্ট স্থানের বালি খুঁড়তেই পাওয়া গেল জগন্নাথ দেবের মন্দির। তখন থেকে পুরী ক্ষেত্র হয়ে উঠল মহা তীর্থক্ষেত্র। উক্ত সাতটি পূণ্যসলিলা তীর্থ ক্ষেত্রে পুনঃপুনঃ দেহত্যাগ করে অবশেষে অষ্টম জনমে এই মেহার প্রদেশে মহাত্মা শম্ভুনাথের পুত্ররূপে মাতৃভক্ত সর্ব্বানন্দ মানবীয় চক্ষুর দ্বারা দর্শণ করবেন ‍‍"রীমায়ের দশবিধ রূপ। সর্ব্বানন্দের সাত জন্মব্যাপী তপস্যা এবং অষ্টম জনমের তপস্যায় সিদ্ধি লাভের ধারাবাহিক বর্ণনা দেন স্বীয় ভাগিনা ষড়ানন্দ। ষড়ানন্দ ছিলেন এক সিদ্ধ পুরুষ।

কিন্তু কোথায় সে জীন বৃক্ষমূলে **মতঙ্গেশ শিব লিঙ্গ** স্থান, কোথায় পাওয়া যাবে শবদেহ। সময় যে চলে যাচ্ছে। একা একা সর্ব্বানন্দের পক্ষে সম্ভব নয়। তবু মাভৈঃ। মাভৈঃ। কারণ মহাদেব প্রদত্ত সর্ব্বসিদ্ধি মন্ত্রতো সাথে আছে। ঠিক যেমনি কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জ্জুনের সাথে ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

তাই ভৃত্যরূপী পরম বান্ধব পুর্ণানন্দের এখন বিশেষ প্রয়োজন। পূর্ণানন্দকে সাথে পাওয়ার জন্য সর্ব্বানন্দ নিজ গৃহাভিমুখে বনপথ দিয়ে রওনা হলেন।

এদিকে পূর্ণানন্দ বাড়ীতে ছিল না। মাঠে ধেনু চড়াতে ছিল। রাজসভায় সর্ব্বানন্দের প্রতি অপমান, বাড়িতে সকলের ভৎর্সনা, সর্ব্বানন্দের গৃহত্যাগ, তালপত্র অন্বেষণ, মহাদেব

প্রদত্ত সর্বসিদ্ধি মন্ত্র ইত্যাদি কোন কিছুই তাঁর কর্ণগোচর হয় নাই। কিন্তু ধ্যানযোগে পূর্ণানন্দ সবকিছুই অবগত হলেন এবং তাড়াতাড়ি বাড়ি অভিমুখে রওনা দিলেন।

এদিকে দীর্ঘ সময় ধরে সর্ব্বানন্দ গৃহে ফিরে না আসায় বাড়ীতে হাহাকার পড়ে গেল। বিশেষ করে পূর্ণানন্দ সর্ব্বানন্দকে হারিয়ে প্রায় অচৈতন্য। সম্বিৎ ফিরে পেলে- হায়! সর্ব্বানন্দ। হায়! সর্ব্বানন্দ চিৎকার করতে করতে গৃহ হতে বের হয়ে বনে বনে ঘুরতে লাগল, কোথায় সর্ব্বানন্দকে পাওয়া যায়?

পাঠক সমাজ ঃ পূর্ণানন্দকে শুধু ভৃত্যরূপে কল্পনা করলে ভুল হবে। পূর্ণানন্দ ছিলেন দেবী পার্বতীর একনিষ্ট ভক্ত এবং অষ্টম জনমে সর্ব্বানন্দকে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার পথে সাধনসঙ্গী হিসেবে দেবী পার্বতী পূর্ণানন্দকে সর্ব্বানন্দের ভৃত্য হিসেবে পাঠিয়েছিলেন।

হঠাৎ বনমধ্যে সর্ব্বানন্দ ও পূর্ণানন্দের দেখা হল। উভয়ের মধ্যে আবার সঞ্চারিত হল শক্তি, সঞ্চারিত হল নব আশা, নব উদ্যম। সর্ব্বানন্দ সবিস্তারে সব কথা পূর্ণানন্দকে বললেন। পূর্ণানন্দ বিস্তারিত শুনার পর উহার গোপনীয়তা রক্ষার জন্য সর্ব্বানন্দকে ইঙ্গিত দিল। পূর্ণানন্দ সর্ব্বানন্দসহ গভীর বনের মধ্য দিয়ে হাটতে হাটতে অগ্রসর হতে লাগল, আর সন্ধান করতে লাগল কোথায় সে জীন বৃক্ষমূল, যেখানে স্থাপিত ছিল মতঙ্গেশ শিবলিঙ্গ। পৌষ সংক্রান্তির অমাবস্যার রাত্রি। একেত গভীর অন্ধকার, তদুপরি শীতের হিমেল হাওয়া। নির্জন বন। মনুষ্য শুধু দু'জন। সর্ব্বানন্দ ও পূর্ণানন্দ। গাছের সরু শুষ্ক শাখার আটিতে অগ্নি প্রজ্জ্বলন করে সে অগ্নির আলোয় পূর্ণানন্দ সর্ব্বানন্দকে নিয়ে অতি সন্তর্পণে পথ চলতে লাগল।

অমাবস্যার রাত্রির অন্ধকারে গহিন বনে পথ চলতে চলতে তারা দেখতে পেল বিষধর সর্প ফণা বিস্তার করে তাঁদের দিকে তেড়ে আসছে, হঠাৎ নজরে পড়ল বাঘ, খরগোশ, শৃগাল আরও কত কি? সর্ব্বানন্দ ভয়ে জরসর। কিন্তু তাঁকে সর্বতোভাবে সাহস যোগাচ্ছে পূর্ণানন্দ। একে একে হিংস্র জন্তু সকল দূরে চলে গেল। কিন্তু জীনবৃক্ষমূলের সন্ধানতো মিলল না। এমন সময় সে গভীর বনে তপস্যারত এক মহাশক্তিশালী মুসলমান দরবেশ যোগবলে জানতে পারলেন যে, সর্ব্বানন্দ ও পূর্ণানন্দ নামে দু'মাতৃভক্ত জীন বৃক্ষমূল অন্বেষণ করছে, কিন্তু পাচ্ছে না। তখন উক্ত দরবেশ সে দু'মাতৃভক্তকে জীন বৃক্ষমূলে পৌঁছার রাস্তা দেখিয়ে দেন। সে থেকে ঐ দরবেশের নাম হলো রাস্তি সাহেব। রাস্তি সাহেবের নির্দেশ মতে তারা সে জীনবৃক্ষমূলে এসে উপস্থিত হল যেখানে মতঙ্গেশ শিবলিঙ্গ স্থাপিত ছিল। এভাবে সর্ব্বানন্দের সাধনস্থান নিরূপিত হলো।

ক্রমে ক্রমে অমাবস্যার রাত্রি গভীর হতে গভীরতর হতে লাগল। পৌষ সংক্রান্তির শীতের রাত্রি, নিবিড় বন, মাত্র একাকি দু'জন। তারপর শবের উপর উপবেশন করে তপস্যা। কিন্তু শব কোথায়? এ গহিন তমসাচ্ছন্ন বনে শব পাওয়া যাবে কোথায়? সর্ব্বানন্দ পূর্ণানন্দকে বলল, "দরকার নেই তপস্যার, চল বাড়ী ফিরে যাই।" পূর্ণানন্দ সাহস সঞ্চার করে বলল, "তুমি তোমার সাত জন্মব্যাপী তপস্যার কথা ভুলোনা। কারণ নদীর তীরে

নৌকা ভিড়লে তখন যদি নৌকাকে ডুবিয়ে দেয়া হয় এর মতো মূর্খতা আর কিছুই হতে পারে না। রাজসভায় তোমার অপমানের কথা ভুলোনা। তার প্রতিশোধ তোমাকে নিতেই হবে। আমি যোগবলে আমার দেহ হতে আত্মাকে পৃথক করব। তুমি আমার শবের উপর উপবেশন করে মনে সাহস সঞ্চার করে মহাদেব প্রদত্ত সর্বসিদ্ধি মন্ত্র জপ করবে এবং দেবী ভগবতীর ধ্যান করবে। তোমার সকল অভিষ্ট পূর্ণ হবে।" সর্ব্বানন্দ পূর্ণানন্দকে আবার বলল, "দাদা, তোমাকে মেরে আমার মায়ের চরণ দর্শন প্রয়োজন নেই।" ঠিক যেমন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে আত্মীয় স্বজনকে মেরে রাজ্যলাভ, এমনকি স্বর্গলাভও প্রত্যাখান করতে চেয়েছিলেন অর্জুন। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অর্জুন তা পারেননি। পূর্ণানন্দ সর্ব্বানন্দকে বলল, "তুমি ভয় পেয়ো না। আমি আবার বেঁচে উঠবো।" সর্ব্বানন্দ বললেন, সত্যি? পূর্ণানন্দ বলল, সত্যি, সত্যি, সত্যি। এখানে উল্লেখ্য কাঁমাক্ষ্যা মন্দিরে বাসুদেবের প্রতি যে দৈববাণী হয়েছিল তা জানার পর থেকেই পূর্ণানন্দ দেহ থেকে আত্মাকে পৃথক করার যোগসাধনা পদ্ধতি অর্জন করেছিলেন। পূর্ণানন্দ বলল, "কিন্তু হে প্রাণপ্রিয়, তোমাকে এক প্রতিজ্ঞা করতে হবে। যখন মা ভগবতী সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে বর প্রদান করতে যাবেন, তখন কোন বর প্রার্থনা না করে বলবে, কি বর চেতে হবে তা আমি অবগত নহি। আমি আমার ভৃত্যের অধীন। আমি এ সকল কিছুই জানিনে। সকল পুণ্যদাদাই জানে।" এখানে উল্লেখ্য যে, পূর্ণানন্দ সর্ব্বানন্দের সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য নিজ দেহ হতে আত্মাকে পৃথক করে শবের ন্যায় পরে থাকবেন। তাঁর বাঁচার নিমিত্ত তিনি সর্ব্বানন্দকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করাণ। অন্যথায় পূর্ণানন্দের বেঁচে উঠার আর কোন পথ থাকবে না। সর্ব্বানন্দ কি করবে ভাবতে পারছেনা। একদিকে সাতজনম ব্যাপি তপস্যার সিদ্ধ হবার ক্ষণ সমাগত। আর একদিকে পরমবান্ধব ভৃত্যরূপী পূর্ণানন্দের প্রাণ বিয়োগ। শ্যাম রাখি না কুল রাখি এ অবস্থা। এমনই ক্রান্তি লগ্নে সর্ব্বানন্দ যখন পূর্ণানন্দকে ডাকতে লাগল, আর ডাকে সারা নেই। নিথরদেহ পড়ে আছে মৃতবৎ। সর্ব্বানন্দের বুঝতে বাকী রইলনা যে পূর্ণানন্দ যোগবলে আপন দেহ হতে আত্মা ইতিমধ্যে পৃথক করে ফেলেছে। অতঃপর সর্ব্বানন্দ গুরুদেব মহাদেবের বিধান অনুযায়ী জীনবৃক্ষমূলে **মতঙ্গেশ শিব লিঙ্গ** যেখানে স্থাপিত ছিল, সেখানে পূর্ণানন্দের শহদেহকে পূর্বমূখীকরে স্থাপন করে তদুপরি আরোহন করতঃ পূর্বমূখী হয়ে গুরু প্রদত্ত **সর্বসিদ্ধিমন্ত্র** জপ করতে লাগলেন। গভীর অমাবস্যার রাত্রি। শীতের শৈত্যপ্রবাহ। নিবিড় বনে জীনবৃক্ষমূলে সর্ব্বানন্দ একা, সম্পূর্ণ একা। প্রাণপ্রিয় ভৃত্য পূর্ণানন্দের শবের উপর বসে গুরুপ্রদত্ত ইষ্টনাম জপ করছেন। মনের কত বড় সাহস, জন্মজন্মান্তরের একাত্মতা কত সুদৃঢ় এবং লক্ষ্যে পৌঁছার প্রতিজ্ঞা কত দৃঢ় হলে তা সম্ভব।

বাস্তবিকপক্ষে দীর্ঘকৃচ্ছ সাধনায় বড় কিছু ত্যাগ না করলে অসম্ভব কিছু প্রাপ্তি হয় না। সাধনায় সিদ্ধিলাভের চূড়ান্ত ক্ষণ সমাগত প্রায়। তথাপি পরীক্ষার শেষ নেই।

কঠিন পরীক্ষা! শেষ পরীক্ষাটি হল কামজয়ের পরীক্ষা। কামদেবের কাজ হল রতিরাণীর মাধ্যমে কামোদ্দীপনা সৃষ্টি করে সাধকের সাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা। কামদেবের কারণে কত মুনি ঋষির সাধনার ভিত কেঁপে উঠত, তপর্শ্চয্যা হত লন্ড ভন্ড, সিদ্ধি লাভ হত সুদূর পরাহত।

শীতের কুঝটিকা পূর্ণ অমাবস্যা যামিনীর তৃতীয় প্রহর। সর্ব্বানন্দের জন্মজন্মান্তর ব্যাপী সাধনার সিদ্ধি লাভ সমাগত। কিন্তু তাকেও দিতে হচ্ছে কামদেবের কঠিন পরীক্ষা। স্বর্গহতে কামদেব রতি রানীকে নিয়ে এলেন সাধনস্থলে মেহার বনানীর জীনবৃক্ষ মূলে। সর্ব্বানন্দের সাধনস্থলে শুরুহল বসন্তের দক্ষিণ হাওয়া। হাস্যোজ্জ্বল উল্লসিতা রতিরানী মোহনীয় সাজে সজ্জিতা হয়ে সর্ব্বানন্দ পাশে দণ্ডায়মান। একটু দূর হতে কামদেব একটি একটি করে তিনটি ফুলশর নিক্ষেপ করলেন সর্ব্বানন্দকে লক্ষ্য করে। কিন্তু একটিও সর্ব্বানন্দের হৃদয় বিদ্ধ করতে পারলনা। বরং তাঁর সাধনতেজের আগুনে উক্ত নিক্ষিপ্ত ফুলশর হল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, হল দগ্ধীভূত। কামদেব সর্ব্বানন্দের কাছে পরাস্ত হলেন। কারণ সর্ব্বানন্দের সাধনরূপ যুদ্ধের সেনাপতি হল ব্রহ্মচর্য্য, আর সৈন্য হল ইন্দ্রিয় সকল। এখানেই সাধকের শক্তি। কামরূপ শত্রুকে পদতলে দলিত করার যে শক্তি সাধকগণ তিলে তিলে সঞ্চয় করেন সে সঞ্চিত শক্তির উপর ভিত্তি করেই সাধকগণ সিদ্ধিলাভের পথে অগ্রসর হন এবং ঐশ্বরিক কৃপায় সিদ্ধি লাভ করেন। সাধক সর্ব্বানন্দও স্থির লক্ষ্য সামনে রেখে ইষ্ট মন্ত্র জপ করছেন। শুধু লক্ষ্য কখন, কখন আবির্ভূতা হবেন মা, কখন দেখবেন ˆরীমায়ের রাঙ্গা চরণ।

রাত্রির শেষপ্রহর। শবের উপর ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সর্ব্বানন্দ দেবাদিদেব মহাদেব প্রদত্ত সর্ব্বসিদ্ধি মন্ত্র জপ করছেন। এমন উৎকট সাধনায় কৈলাসে পার্বতীর আসন টলটলায়মান। ঠিক যেমন ধ্রুবের উৎকট সাধনায় ভগবান পদ্মপলাশলোচন শ্রী হরির আসন হয়েছিল টলায়মান। পার্বতী আর স্থির থাকতে পারলেন না।

রাত্রির শেষ প্রহর অতিবাহিত হতে চলছে। হঠাৎ দশদিক আলো করে সর্ব্বানন্দের হৃদপদ্মহতে চন্দ্র, সূর্য সদৃশ নির্মল ও তেজোময় এক অগ্নিপিন্ডাকৃতি পদার্থ উত্থিত হয়ে সমস্ত বন ব্যাপিত হল। ঐ তেজোময় অগ্নিপিন্ডাকৃতি পদার্থ ক্রমশঃ গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে আসলে তাতে সুনির্মল ইষ্টদেবীর প্রতিবিম্ব দেখতে পেলেন সাধক সর্ব্বানন্দ। অনন্তর পুনঃপুনঃ তা অবলোকন করতে করতে স্বীয় ইষ্ট দেবীকে দেখতে পেলেন। ষোড়শী চতুর্ভূজা-ভক্ত বৎসলা মা ত্রিপুরাসুন্দরী। মা ত্রিপুরা সুন্দরীর সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। নীল পদ্মসদৃশ সুন্দর নেত্রযুক্তা, সতত দয়ার্দ্র হৃদয়বিশিষ্টা, সাধককুলের অভীষ্ট বরপ্রদায়িনী, ভক্তদের মঙ্গলাকাঙ্খী, শান্তদের শান্তিদায়িনী, জবাপুষ্পের ন্যায় সুন্দর আভাযুক্তা, কোটি চন্দ্রকিরণের ন্যায় শীতল জ্যোতিপূর্ণা, পদ্মসদৃশ কোমল হস্তবিশিষ্টা, চন্দ্রসূর্যসদৃশ উজ্জ্বল চক্ষুজ্যোতি সম্পন্না, ত্রিলোক-জননী, নিত্যা, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষদায়িনী এবং সদা আনন্দপ্রদায়িনী। দেবীর বর্ণনায় সর্ব্বানন্দ,

সূর্যকোটি প্রতিকাশাং চন্দ্রকোটি সুশীতলাং।
পদ্মাহস্তা পদ্মাননা সাধকাভিষ্ট দায়িনী ॥
শতকোটি দিবাকর কান্তি যুতং
বিধি-বিষ্ণু শিরোমণি রত্ন ধৃতম।
চল-দুজ্জ্বল নূপুর গান যুতং
জগদীশ্বরী তারিণী তে চরণম্ ॥

সর্ব্বানন্দ দেবীর ধ্যান চিন্তা করতে লাগলেন। দেবী প্রসন্না হয়ে বললেন, "হে বৎস, তোমার তপস্যায় আমি তুষ্ট। তুমি শীঘ্র তোমার কাঙ্খিত বর প্রার্থনা কর। রাত্রি শেষ হয়ে যাচ্ছে। মহাদেবের কৈলাশপুরী শূণ্য। আমি তোমাকে পুত্রবৎ পালন করব এবং যখনই যা প্রার্থনা করবে, আমি তা পূর্ণ করে দিব। তুমি শীঘ্র তোমার মনোনীত বর প্রার্থনা কর।" শ্রীমায়ের মূখনিঃসৃত-এরূপ বাক্য শ্রবণ করে সর্ব্বানন্দ শবাসন হতে উত্থিত হয়ে কালীদাসের ন্যায় দেবীর স্তব আরম্ভ করলেন।

যা ভূতান বিনিপাত্য মোহজলধৌ সংনর্ত্তয়ন্তী স্বয়ং।
যন্মায়া পরিমোহিতা হরিহর ব্রহ্মাদয়ো জ্ঞানিনঃ ॥

অনুবাদ ঃ যিনি জীবগণকে অকুল সাগরে ফেলে নাচাচ্ছেন এবং যার মায়ায় হরিহর জ্ঞানীগণ মোহিত হন।

যস্যা ঈষদনু গ্রহাৎ করগতং যদ্যোগি গম্যং ফলং।
তুচ্ছং যৎপদ সেবিনাং হরিহর ব্রহ্মত্ব মস্যৈনমঃ ॥

অনুবাদ ঃ যার সামান্য অনুগ্রহে যোগী ঋষিগণ সহজেই উদ্ধার পায় এবং যার পাদপদ্মের কাছে সেবকগণের নিকট ব্রহ্মত্বও তুচ্ছ, তাঁকে প্রণাম করি।

বেদো ন যৎপারমুপৈতি মাতঃ। নৈবাগমোন প্রমথাধিপশ্চ।
কস্মান্নরঃ ক্ষীণমতি স্তবাম্ব! অদ্রূপ সম্ভাবন তৎপর স্যাম্ ॥

অনুবাদ ঃ আগম এমন কি প্রথমাধিপতি শিবও যে রূপের অন্ত পান নাই; হে মাতঃ হীন বুদ্ধি মূর্খ মানব কিরূপে তোমার ধারণা করবে।

যত্তেজসো মন্ডল মধ্যসংস্থা হরাদয়ঃ কোটি দিবাকরাভাঃ
বিভান্তি - পূর্নেন্দু সমপসংস্থা স্তারা যথা ব্যোমতলেহ পাজস্রাঃ ॥

অনুবাদ ঃ যার তেজে এ পৃথিবীতে হরাদি দেবগণও কোটি সূর্য্যের ন্যায় এবং আকাশে পূর্ণচন্দ্রও অসংখ্য তারকার ন্যায় শোভা পায়

যা জীবরূপা পরমাত্মরূপা যা পুংস্বরূপা চ কলত্ররূপা।
যা কামমগ্না পরিভগ্ন কামা তস্মৈ নমস্তভ্য মনন্ত মূর্ত্ত্যৈ ॥

অনুবাদ ঃ যিনি জীব এবং পরমাত্মার ন্যায়। যিনি কামে মগ্না ও কামে পরিভগ্না। সে অনন্ত রূপিনী দেবীকে প্রণাম করি।

ত্বমেব বিষ্ণুশ্চতুরানন স্তং ত্বমেব সর্ব্বঃ পবন স্তমেব।
ত্বমেব সূর্য্যঃ শশালাঞ্ছন স্তং ত্বমেব সৌরিস্ত্রিদশা স্তমেব ॥

অনুবাদ ঃ হে মাতঃ। তুমি বিষ্ণু এবং তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারিনী। তুমিই পবন, তুমি চন্দ্র, সূর্য্য, তুমি সংসার কর্ত্রী এবং তুমি সংসারের যাবতীয় দেবরূপে অবতীর্ণা।

ত্বং বেদরূপা খিল বেদবাচ্যা।
ত্বং সর্ব্ব গোপ্যা সকল প্রকাশ্যা ॥

অনুবাদ ঃ তুমিই বেদ এবং তুমিই বেদের অভিধান স্বরূপিনী। তুমি সকলের নিকট গুপ্তা থাক এবং সময়ানুসারে তুমিই আত্মায় প্রকাশিতা হও।

সংসার - সাগর - তরি স্তব পাদপদ্মং।
নান্যত্বদস্তি গুরবঃ শ্রুতয় স্তথান্যে ॥

অনুবাদ ঃ হে মাতঃ! পূজনীয়গণের নিকট জানতে পারি এবং বেদেও উক্ত আছে, এ অকুল সাগরে তোমার পাদপদ্মই একমাত্র তরণী।

যাতে তত্র হৃদি প্রযান্তি সখিতা মেতে সমস্তাঃ পুনঃ।
তস্মাত্তেহপিন দুঃখদা ন সুখদা মাহাত্ম্য মেতত্তব ॥

অনুবাদ ঃ যখন প্রাণময় তোমায় বিশ্বাস করে, তখন তুমি খেলার সাথীর ন্যায় হও; এবং রিপুগন সুখ-দুঃখ দেয়না। এসকল তোমারই মহিমা।

কিংবা কোটি সহস্র কল্প কলিতৈর্ধ্যানৈ স্তথা যোগতঃ।
মাতস্ত্বৎ পদপঙ্কজে যদি মনঃ স্বল্পঞ্চ বিশ্রামাতি ॥

অনুবাদ ঃ কিম্বা যদি তোমার পাদ পদ্মে মতি না থাকে, কোটি ধ্যান-যোগাদি করিয়াইবা কি ফল?

ধ্যাতুং কিং ক্ষমতা মুপৈতি বিধিবদ্ দেবস যোগীশ্বরো।
হপ্যস্মাকং সুতরাং তথা পুরুষতা নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব চ ॥

অনুবাদ ঃ মাতঃ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবও বিধিমত তোমার ধ্যানের উপযুক্ত নন। ক্ষুদ্রপ্রাণা মানব এ বিষয় কি বলব।

যদ্যেতেন চ তেন চ ত্রিনয়নি ধ্যেয়ং ন রূপং তথা।
তন্মাত্বা বিরমো ভবেন্ন জগতাং কেনাপি দুঃখক্ষয়ঃ ॥

অনুবাদ ঃ ত্রিলোচনে যদিও তোমার রূপ ধ্যান করতে কেহ সমর্থ হন না; তথাপি তোমার ধ্যান ব্যতিত এ ভব সংসারে দুঃখ ক্ষয়ের অন্য কোন পন্থা নেই।

কিন্তুত্বৎ পদসেবনায় চ সদা যেষাং দৃঢ়ং মানসং।
তেমুক্তা নিগমাগম শ্রুতিগণৈ গীতস্ত্বিদং মে দৃঢ়ং ॥

অনুবাদ ঃ যদি কেহ তোমার চরণযুগল পূজা করতে বাসনা করে, বেদ, আগমেও লিখিত আছে সে নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করবে।

ঠাকুর সর্ব্বানন্দ দেবের স্তবে তুষ্ট হয়ে জগৎপালিনী দেবী বললেন, "বৎস! তোমার স্তবে তুষ্ট হলাম। সাধনায় বিরত হও। আমিই জীবের ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষদায়িনী। আমিই জীবের সকাম ও নিষ্কাম উভয়বিধ বরদাত্রী। সময় অত্যন্তকম।

তুমি তাড়াতাড়ি তোমার অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর। আমি নিশ্চয়ই প্রদান করব।" সর্ব্বানন্দ বললেন, "মাতঃ! আর কি বর প্রার্থনা করব। হরিহর বিরিঞ্চি সেবিত তোমার রাঙ্গা শ্রীচরণ পাদপদ্ম দর্শনে আমার সকল বর লাভ হয়েছে। তথাপি যদি আরও বর প্রদানে আপনার কৃপা হয়, তৎসম্বন্ধে আমি কিছুই অবগত নই। সকলই শবাসনে শায়িত পূণাদাদা জানে।" অতঃপর দেবী পুর্ণানন্দের মস্তকে বাঁ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা উষ্ঠা প্রদান করত বললেন, "উঠ, নির্বংশীয়া।" পূর্ণানন্দ সচেতন হল এবং দেবীর ভূবন মোহিনী রূপ দর্শন করে ধন্য হল। তারপর পূর্ণানন্দ এবং সর্ব্বানন্দ উভয়ে একত্রে ˇরীমায়ের স্তবস্তুতি করতে লাগল। উভয়ের স্তব শুনে দেবী সন্তুষ্ট হলেন এবং পূর্ণানন্দকে বললেন, "তোদের কি বর প্রার্থনা, তাড়াতাড়ি কর। আমার সময় কম।" পূর্ণানন্দ বলল, "মাতঃ! আমাদের প্রতি যদি তোমার করুণা থাকে তবে তোমার শ্রী চরণে এই বর প্রার্থনা, তোমার পরমোৎকৃষ্ট দশবিধরূপ দর্শন দানে আমাদের কৃতার্থ কর।"

একেই বলে অহৈতুকী ভক্তি, অহৈতুকী তপস্যা। কোন হেতু নয়, জড় জাগতিক চাওয়া পাওয়া নয়। নয় কোন ধন, জনের প্রার্থনা, নয় কোন কামনা বাসনা, এমনকি মোক্ষপ্রাপ্তির প্রার্থনাও নয়। বিনীত প্রার্থনা কেবল ˇরীমায়ের রাঙ্গা চরণ দর্শন, ˇরীমায়ের রূপদর্শন। একেই বলে ভক্তিযোগ। বৈদিক শাস্ত্র এবং তন্ত্রশাস্ত্রে, আগমে ও নিগমে সাধনমার্গের চূড়ামনি হল এ ভক্তিযোগ। এ ভক্তিযোগের ফলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্যবন্ধু দরিদ্র ব্রাহ্মণ সুদামা দ্বারকায় কৃষ্ণের প্রসাদে উপস্থিত হয়েও ব্যক্তিগত জড়জাগতিক সুখ, সম্পদ প্রার্থনা করে নাই। একই ভক্তিযোগে অবলম্বনের ফলে স্বামী বিবেকানন্দ বারবার জগন্মাতার কাছে যেয়েও চেতে পারেননি কিছুই। শুধু ভক্তি আর ভক্তি। অহৈতুকী ভক্তির কারণেই শ্রী সনাতন গোস্বামী পরশপাথর পেয়েও উহাকে তুচ্ছজ্ঞান করে বালির স্তুপে ফেলে দেন। শিশুকে মাতৃদুগ্ধ চেতে হয় না। মাতাই ভাল জানেন শিশুর কখন কি দরকার। শিশু শুধু চায় মাতৃসান্নিধ্য। অতঃপর দেবী সর্ব্বানন্দ ও পূর্ণানন্দের ভক্তিযোগে প্রীত হলেন এবং

কালীতারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভূবনেশ্বরী
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা ॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা ॥
এতাদশ মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা প্রকীর্ত্তিতা ॥

এ দশবিধ রূপে একে এক প্রকাশিত হয়ে ভক্তপ্রবর সর্ব্বানন্দ ও পূর্ণানন্দের সম্মুখে প্রত্যক্ষ্যা হলেন। ˇরীমায়ের এ দশবিধরূপ এক এক করে দর্শনের পর সর্ব্বানন্দ ও পূর্ণানন্দ উভয়ে ˇরীমায়ের স্তব করতে লাগল এবং মায়ের চরণে ভক্তি নিবেদন করে

প্রার্থনা জানালো, "মাতঃ! তোমার যদি এতই কৃপা এ অধমদের প্রতি থাকে, তবে তোমার এ শ্রেষ্ট দশরূপ আমাদেরকে একত্রে দর্শন দান কর।"

ˇরীমা এ প্রার্থনার কথা শুনে কহিলেন, "তোরা কি আমার দশবিধ রূপ একত্রে দর্শন করে স্থির থাকতে পারবি? যা পূর্বে দেবাদিদেব মহাদেবও পারেনি।" ˇরীমায়ের কাছ থেকে এ প্রশ্ন শুনে ভক্তদ্বয় বলল, "মাতঃ! আমরা পারব। তুমি দয়া করে দর্শন দাও।" প্রকৃত পক্ষে দিব্যজ্ঞান এবং দিব্যচক্ষু সম্পন্ন না হলে ˇরীমায়ের দশবিধরূপ একত্রে প্রত্যক্ষ করা কোন সাধকের জন্যই সম্ভব নয়। কিন্তু বিগত সাত জনমের নিরলস তপশ্চর্যার ফলে সর্ব্বানন্দের ঐ ঐশ্বরিক ক্ষমতা পূর্বেই অর্জিত হয়েছিল। মা পার্বতীর পরম ভক্ত হিসেবে সাধনসঙ্গী পূর্ণানন্দেরও এ ক্ষমতা অর্জিত ছিল। মা তো অন্তর্যামী, তিনি সব জানেন। পরে দয়াপরবশ হয়ে দু ভক্ত প্রবরকে তাঁর দশমহাবিদ্যা রূপের একত্রে দর্শন দান করেন।

এ যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের সমতুল্য। সর্ব্বানন্দ ও পূর্ণানন্দ নয়নভরে মায়ের ভুবন ভুলানো এরূপ দেখলেন। সাঙ্গ হলো সর্ব্বানন্দের সাতজনম ব্যাপি সাধনা, সাধনায় হলেন তিনি সিদ্ধ। আর পূর্ণানন্দের সহযোগীতায় সর্ব্বানন্দের সাধন সিদ্ধিতে হল ˇরীমায়ের অভিষ্ট পূরণ। পূর্ণানন্দ সবশেষে ˇরীমায়ের নিকট সেদিন সকালে রাজসভায় সর্ব্বানন্দের মূর্খতা বশতঃ অমাবস্যা তিথিকে পূর্ণিমা তিথি বলার ঘটনার প্রতিকারের প্রার্থনা জানিয়ে ছিলেন।

ভক্তবৎসল সন্তানের কোন অপমান মা সহ্য করতে পারেন না। সন্তানের প্রতি কেউ অপমান করে থাকলেও মা নিজেই অলৌকিক ভাবে উক্ত অপমানের প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন। শুধু মায়ের প্রতি সন্তানের অহৈতুকী ভক্তি দরকার। ˇরীমা তখন তার পবিত্র নঁখেন্দু (বাম হস্তের কণিষ্ঠাঙ্গুলীর নখ) দ্বারা ঘোর অমাবস্যার রাত্রিতে কলঙ্ক বিহীন পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় জগৎ আলোকিত করলেন। দেখিয়ে দিলেন, সেদিন অমাবস্যা নয়, সেদিন ছিল পূর্ণিমা। মাঁ দেখিয়েছেন, তার ভক্ত সর্ব্বানন্দ মূর্খ নয়। সর্ব্বানন্দ মহা পণ্ডিত, সর্ব্বানন্দ সাধক কুলের চূড়ামনি, মা দেখিয়েছেন, তার ভক্ত সর্ব্বানন্দ যা বলে তা মিথ্যে নয়। বরং অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সর্ব্বানন্দ হলেন বাকসিদ্ধ। অতঃপর ˇরীমা জীনবৃক্ষমূলে মেহার কাননকে মহাতীর্থে পরিণত করে কৈলাসে চলে গেলেন। সেসময় হতে জগৎজননীর পূণ্যপদস্পর্শে ধন্য এ স্থান দেশে বিদেশে **মেহার কালীবাড়ি** নামে পরিচিত হয়ে আসছে। বিশ্বের অন্যান্য কালী বাড়ির মত এখানে কোন কালীমূর্তি নেই। ˇরীমায়ের দর্শন লাভের পর পূর্ণানন্দ মাকে বললেন, "মাতঃ! আমরা কোন রূপে তোমাকে এখানে প্রতিষ্ঠা করব।" মা বললেন, "আমার অসংখ্যরূপ। তন্মধ্যে পরমোৎকৃষ্ট দশবিধ রূপ তোমরা দর্শন করেছ। যা ইতিপূর্বে দেবাদিদেব মহাদেবই দর্শন করেছিলেন। এখানে আমার কোন রূপের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নেই, আর মন্দির স্থাপনেরও প্রয়োজন নেই। আমি বিশ্ব প্রকৃতি। প্রকৃতিতেই অবস্থান করব। যখনই কোন ভক্ত এ স্থানে এসে আমার পূজা অর্চনা করে মা, মা বলে আমায় ডাকবে, আমি তৎক্ষনাৎ এসে উপস্থিত হব এবং তার মনবাসনা পূর্ণ করব।"

তৎপর হতে অসংখ্যভক্ত ˇরীমায়ের আশীর্বাদ লাভের জন্য শ্রী শ্রী মেহার কালীবাড়ীতে আসছেন এবং মাঁয়ের আশীর্বাদ লাভ করছেন।

ধন্য মেহার। ধন্য মেহারের মাটি। ধন্য মেহারের জীনবৃক্ষমূল বনরাজি। কলিযুগের বহুপূর্বে মেহারের এ জীন বৃক্ষমূলে ছিল মাতঙ্গমুনির আশ্রম। তথায় মা ভবানী দেবীর মন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত মাতঙ্গমুনি প্রতিষ্ঠা করেন **মতঙ্গেশ শিবলিঙ্গ**। যা কলিতে পাতালগামী। বহু বহু বৎসর পর মেহার আবার জেগে উঠল।

মেহারের মাটিতে পদস্পর্শ করেন দেবাদিদেব মহাদেব। একইদিনে এ জীন বৃক্ষমূলে প্রত্যক্ষ্যা হন মাঁ রাজরাজেশ্বরী। উক্ত একইদিনে এ মেহার উদ্যানেই মাঁ তাঁর দশবিধ রূপ একত্রে দর্শন করান ভক্তপ্রবর সর্ব্বানন্দ ও পূর্ণানন্দকে। তাই ভূবনেশ্বরী মাতা মেহারেশ্বরী নামেও দেশে বিদেশে সুপরিচিতা। ঠাকুর সর্ব্বানন্দের সিদ্ধিলাভের পর হতে এ পূণ্যভূমি বিশ্বের সর্বত্র **দশমহাবিদ্যাসিদ্ধ পীঠস্থান** হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। এ দিনেই সর্ব্বানন্দ হন বাকসিদ্ধ। নদীয়া, বৃন্দাবন, পুরীর মতই মেহারও বিশ্বের এক মহাতীর্থ।

রাত্রির শেষ প্রহর। মেহার পুরবাসী সকলে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। কেহ জানতেই পারলনা, কেহ বুঝতেই পারলনা ক্ষণকাল পূর্বে এ মেহারের জীনবৃক্ষমূলে কি দৈবলীলা সংঘটিত হয়েছে।

রাজা জঁটাধরও নিদ্রিত। এক স্বপ্ন দর্শনে তিনি শয্যা হতে উঠে বসলেন এবং চিন্তামগ্ন হলেন। এমন সময় রাজা দেখতে পেলেন এক অলৌকিক দৃশ্য। বাতায়ন ছিদ্রপথে আলোর রশ্মি শয়ন কক্ষে প্রবেশ করছিল। রাজা ভাবলেন। অমাবস্যার রাত্রিতে আলো! এ কি স্বপ্ন? রাজা তৎক্ষনাৎ প্রাসাদের চূড়ায় আরোহন করলেন এবং সবিষ্ময়ে দেখলেন কলঙ্ক বিহীন পূর্ণ চাঁদের আলোয় সমস্ত আকাশ, সমস্ত বনরাজি, সমস্ত মেহার নগরী জ্যোৎস্নাস্নাত। পড়ে গেল হৈ চৈ। রাজা অমাত্যবর্গদের জানালেন এ বারতা। বাজালেন বিজয় ঘন্টা। বিজয় ঘন্টা ধ্বনি শোনে মেহারের প্রজাকুল সকলে ঘুম থেকে উঠে অমাবস্যায় পূর্ণিমার চাঁদ এবং জ্যোৎস্না অবাক বিষ্ময়ে পর্যবেক্ষণ করল। ধীরে ধীরে অঘটন ঘটন পটিয়সী সে মহিমান্বিত রজনীর হল অবসান। পূর্বাকাশে রক্তিম সূর্যের আভা। দলে দলে লোক ছুটল রাজবাড়ী অভিমুখে।

এ রহস্যের শেষ কোথায়? অমাত্যবর্গদের সাথে পরামর্শক্রমে রাজা জ্যোতির্বিদগণকে রাজসভায় ডেকে আনলেন। ঘোষণা করলেন গতরাত্রির অপ্রত্যাশিত ঘটনার প্রকৃত ব্যাখ্যা যে জ্যোতিষ দিতে পারবে, তাঁকে উপযুক্ত পুরষ্কার প্রদানে সম্মানিত করা হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জ্যোতির্বিদদের অভিমত হল ইহা একটি দৈব ঘটনা। দেবত্বশক্তি অনুকূলে থাকলে অসম্ভব হয় সম্ভব।

নরপতি তখন সভাস্থলে উপবেশন করে আক্ষেপ করছেন, "গতকাল গুরুপুত্র সর্ব্বানন্দকে রাজসভায় আমি অত্যন্ত অপমান করেছি। অমাবস্যা তিথিকে পূর্ণিমা তিথি

বলার মূর্খতার কারণে শুধু আমি নয়, সভাসদবৃন্দ সকলেই সর্ব্বানন্দকে করেছে চরম বিদ্রুপ, ঠাট্টা ও উপহাস।

এখন মনে হয় গুরুপুত্রের কথাই ঠিক হল। তিঁনিই হয়ত লভিয়েছেন কোন দৈবশক্তি।" রাজা ঘোষণা করলেন গুরুপুত্রের সন্ধান যে দিতে পারবে তাকে যোগ্য পুরস্কারে ভূষিত করা হবে।

দলে দলে লোক সর্ব্বানন্দের সন্ধানে বের হল। কিন্তু গুরুপুত্রের সন্ধান কেউ দিতে পারেনি।

সহসা এলো এক কাঠুরিয়া। কাঠুরিয়া রাজা সমীপে বলল 'মহারাজ, পেটের দায়ে গভীর বনে কাঠ কাটতে যেয়ে এবং যুগলমূর্ত্তী দরশন করে পুলকিত এবং শিহরিত হলেম।

রাজা জঁটাধর মনে মনে নিশ্চিত হলেন যে ঐ দু'ব্যক্তি অবশ্যই গুরুপুত্র সর্ব্বানন্দ এবং তদীয় ভৃত্য পূর্ণানন্দ। আর বিলম্ব নয়। কাঠুরিয়ার সঙ্গে রাজা বনপথে চলতে লাগলেন। মনে বড় অনুতাপ। গুরু পুত্রকে অপমানিত করার পাপাগ্নি যেন তাঁকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ তাকে করতেই হবে। পাপবোধে জর্জরিত দেহমন নিয়ে বনমধ্যে হাটতে হাটতে কাঠুরিয়া শেষ পর্যন্ত রাজাকে সে জীনবৃক্ষ মূলে নিয়ে পৌঁছলেন যেখানে সর্ব্বানন্দ ও পূর্ণানন্দ শাস্ত্রালোচনায় রত।

ভূপতিকে দেখে জয়! মহারাজের জয়! বলে সর্ব্বানন্দ রাজাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করলেন। রাজা সভক্তিতে করজোড়ে বললেন, "গুরুদেব, আমি আপনার নিকট অনেক, অনেক অপরাধ করেছি, ক্ষমা করুন।"

ঠাকুর সর্ব্বানন্দ বললেন, "বৃথা কেন অস্থির হয়ে আত্মগ্লানি করছ। লোকে তোমাকে যতই অপরাধী বলুক না কেন, আমি তোমার এক বিন্দুও দোষ দেখি না। তুমি যদি আমার দোষ না ধরতে, তবে বোধ হয় মায়ের দশবিধরূপ দর্শন লাভ করতে পারতাম না।"

এইরূপে সর্ব্বানন্দ রাজাকে নানা প্রকারে সান্তনা প্রদান করে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত শুভ ফল এবং পর জন্মের বিদ্যা শিক্ষার আকাঙ্খায় যে সব ঘটনা ঘটেছিল, তা ব্যক্ত করেন এবং গাঢ় আলিঙ্গন করতঃ রাজা জটাধরকে পাপ হতে মুক্ত করলেন। এভাবে রাজা জটাধরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হল।

সংবাদ পেয়ে সেখানে ক্রন্দনরতা অবস্থায় পৌঁছল সর্ব্বানন্দ পত্নী বল্লভা দেবী, সাথে পুত্র শিবনাথ এবং অগ্রজ আগমাচার্য্য। বল্লভাদেবী লজ্জায় অধোমুখ। পতি নিন্দার পাপবোধে জর্জরিত। পুত্র শিবনাথও পিতৃনিন্দার মহাপাপে বেদনাহত। অগ্রজ আগমাচার্য্য ভ্রাতৃনিন্দার অন্তর্জ্বালায় জর্জরিত এবং লজ্জিত। সর্ব্বানন্দ শুধু যে তাদের কে ক্ষমা করেই মহত্ব দেখিয়েছেন তা নয়, বরং বলেছেন, সর্ব্বানন্দের প্রতি গতকাল

ভ্রাতা, জায়া, পুত্র এবং রাজ সভাসদগণ যে অপমান এবং নিন্দার বিষ ঢেলেছিল, সে বর্ষিত বিষই সর্ব্বানন্দের জীবনে এনে দিয়েছে অমৃতত্ব, মেহারের জীনবৃক্ষ মূলকে পরিণত করেছে মহাতীর্থক্ষেত্রে।

তারপর সর্ব্বানন্দের ইশারায় পূর্ণানন্দ উপস্থিত সকলের নিকট গতকালের মতঙ্গেশ শিবলিঙ্গ স্থলে জীনবৃক্ষমূলে শবারোহনে সর্ব্বানন্দের সাধনা, ˘রীমায়ের আবির্ভাব, ˘রীমায়ের দশবিধরূপ একত্রে দর্শন এবং ˘মায়ের নখেন্দু দ্বারা অমানিশার অন্ধকারে কলঙ্ক বিহীন পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় জগৎ আলোকিত করার ঘটনা একে একে বর্ণনা করলেন। পূর্ণানন্দের মুখে দৈব ঘটনা সকল মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে সকলে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠল। যেন মেহার নাচতেছে। রসিক ভক্তদের হৃদয়ে প্রায় ৬০০ বৎসর আগের মেহারের ঘটনা থাকবে চির জাগ্রত, চির আনন্দময়। এ যেন মহামিলনের আনন্দ।

সিদ্ধি লাভের পর সর্ব্বানন্দ লোকালয় হতে দূরে একাকী থাকতে পছন্দ করতেন। কারও সাথে বাক্যালাপ বেশী পছন্দ করতেন না। সর্ব্বানন্দের সাধনায় সিদ্ধি লাভের পর রাজা সন্তোষ্ট হয়ে সর্ব্বানন্দকে পারস্য দেশীয় একটি মহামূল্যবান শালচাদর উপহার দেন। সর্ব্বানন্দ শালখানা সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরবার পথে এক বারবনিতা শীতে কাঁপতে কাঁপতে উক্ত শালখানা পাবার প্রার্থনা করলে পরম দয়াময় সর্ব্বানন্দ ঠাকুর উক্ত শালখানা শীতে কাতর বারবনিতাকে দিয়ে দিলেন। এমন সময় রাজপরিষদের জনৈক পণ্ডিত ইহা দেখে ফেললেন। সোজা ব্যাপারকে সোজাভাবে না দেখে একটু বাঁকা ভাবে দেখা সাধারণ এক বাঙ্গালীর মজ্জাগত স্বভাব।

যেমনি দেখা অমনি রাজপরিবারে গমন। মহারাজ করজোড়ে পণ্ডিত মশাইকে প্রণাম জানিয়ে আসনে উপবেশন করতে বললেন। কিন্তু পণ্ডিত মশায় আসনে উপবেশন না করে দণ্ডায়মান অবস্থায়ই বললেন, "মহারাজ, আপনি যে শালখানা গুরুদেবকে উপহার দিয়েছেন, গুরুদেব এক বারবনিতাকে উক্ত শালখানা দান করেছেন।"

গুরুদেব একজন বেশ্যাকে মহামূল্যবান শালখানা দান করলেন এ কথা শুনামাত্র দাসরাজা বড় অপমান বোধ করলেন এবং আক্রোশে ফেটে পড়লেন। তখনই প্রহরীকে আদেশ করলেন। "আমার পরমারাধ্য গুরুদেব যে ললনাকে শালখানা দিয়েছেন, শালসহ তাকে এ মূহুর্তে আমার দরবারে নিয়ে এসো।" আদেশ পাওয়া মাত্র প্রহরী অনতি বিলম্বে উক্ত বারবণিতাকে শালসহ রাজদরবারে উপস্থিত করালেন।

রাজার প্রশ্নে ললনা ভয়ে ভয়ে জবাব দিল যে সর্ব্বানন্দ ঠাকুরই তাকে শালখানা দিয়েছেন। পরে রাজার আদেশে ভয়ে কম্পিত হয়ে সে শালখানা রাজাকে ফেরত দিল। রাজা শালখানা লোহার সিন্দুকে রেখে ক্রুদ্ধভরে প্রহরীকে আদেশ করলেন, "যাও, গুরুদেবকে নিয়ে এসো।"

প্রহরীর সাথে গুরু সর্ব্বানন্দদেব ভাগিনা ষড়ানন্দসহ রাজসম্মুখে উপস্থিত হওয়া মাত্র মহারাজ ক্রোধনেত্রে গুরুদেবকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার প্রদত্ত শীতবস্ত্র খানা কোথায়?"

গুরুদেব বললেন, "আমার বাড়ীতে স্ত্রীর নিকট আছে।"

মহারাজ বললেন, "উহা আমি পুনঃ দেখতে চাই।" গুরুদেব সর্ব্বানন্দ স্বীয় ভাগিনা ষড়ানন্দকে বললেন, "যাও বাড়ী যেয়ে তোমার মামীর কাছ থেকে শালখানা নিয়ে এসো।"

ষড়ানন্দ বাড়ীতে এসে দেখল ঘরের দরজা বন্ধ। দরজায় জোরে আঘাত করা সত্ত্বেও দরজা খুললনা। সর্ব্বানন্দ পত্নী বল্লভাদেবী বাড়ীতে ছিলেন না। কাজ উপলক্ষ্যে অন্য বাড়ী গিয়েছেন। ষড়ানন্দ জোরে চিৎকার করতে লাগল। কিন্তু কোন সারাশব্দ না পেয়ে একরকম হতাশ হয়ে ফিরতে উদ্যত, এমন সময় হল দৈবকরুণা। দেবী ভগবতী রাজপ্রদত্ত অবিকল আর একখানি শাল জানালার ফাঁক দিয়ে ষড়ানন্দের গাত্রে ফেলে দিলেন।

ষড়ানন্দ রত্নখচিত কঙ্কন দ্বারা অলংকৃত দেবীর শ্রীহস্ত দর্শনে বিমল আনন্দ লাভ করলেন। দেবীর প্রেরণা ও ঐশীশক্তিতে দেবীর শরণ লয়ে ষড়ানন্দ শালখানা কাঁধে ফেলে দেবীর স্তব করতে করতে সর্ব্বানন্দের নিকট রাজভবনে চললেন।

তমীশ্বরী পূর্ণশশাঙ্ক রূপা মেহার দেশে খিলসং প্রতিষ্ঠা।
রাজ্ঞা সুভাগ্যাতিশয় ধন্যাঃ সমস্ত পুরবাসীলোকাঃ ॥

হে মাতঃ জগজ্জননী জগদীশ্বরী, আজ মেহার রাজের পূর্বজন্মার্জিত অশেষ সুকৃতি বলে তোমার কঙ্কন শোভিতা শ্রী হস্তে শাল নিক্ষেপ করার দর্শন পেয়ে আমিও ধন্য হলাম। সঙ্গে সঙ্গে মেহার রাজধানীর নর-নারী এবং জীবজন্তু সকলেই ধন্য হল।

ষড়ানন্দ শালখানা সর্ব্বানন্দের হাতে দিলে তিনি রাজাকে একটু ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, "এই নাও রাজা, তোমার শাল।" শালখানা হাতে নিয়ে রাজা বারবনিতা থেকে নেওয়া শালখানার সাথে ইহার তুলনা করলেন এবং দুটি শাল এমনভাবে হুবুহু মিলে যাচ্ছে যে কোনটি রাজপ্রদত্ত তা চিনতেই পারলেননা। বাকসিদ্ধ সর্ব্বানন্দ দেব ক্রুদ্ধভাবে রাজাকে বললেন, "যেখানে গুরুর প্রতি শিষ্যের এমন অবিশ্বাস, সেখানে তোমার রাজ্য ত্যাগ করে কাশীধামে চললাম।"

ঠাকুর সর্ব্বানন্দ মেহার ত্যাগ করার পূর্বে সাধনসঙ্গী পূর্ণানন্দ এবং ভাগিনা ষড়ানন্দসহ মেহারের মাতঙ্গাশ্রমে স্বীয় সিদ্ধপীঠ স্থানে গমন করেন।

মেহার সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের জন্মজন্মান্তরের একনিষ্ঠ সাধনার সিদ্ধ পীঠস্থান। সে মেহার ত্যাগ করে ঠাকুর চলে যাচ্ছেন। এ সংবাদ শ্রবণ মাত্র মেহারের আকাশ, বাতাস প্রকৃতি শোকে শোকাকুল হয়ে উঠল। বিষাদ মিশ্রিত বিরহের করুণ রাগে হাস্যোজ্জ্বল মেহার নগরীকে গ্রাস করল হাহাকারের অন্ধকারে। এ যেন কৃষ্ণহারা বৃন্দাবনের আর এক প্রতিচ্ছবি! এ যেন গৌরহারা নবদ্বীপ! দলে দলে লোক মেহারের সিদ্ধপিঠ স্থানে

আসতে লাগল। অচিরেই নিবিড় বন লোকরণ্যে পরিণহ হল। এ সংবাদ সর্ব্বানন্দ পত্নী বল্লভা দেবীর কর্ণে পৌছালে তিনি স্বীয় পুত্র শিবনাথসহ পতির উদ্দেশ্যে সিদ্ধপীঠ স্থানে উপস্থিত হলেন, এবং দুঃখিত অন্তঃকরণে ঠাকুরকে বললেন, "প্রাণ নাথ, আমি জপ তপ কিছুই জানিনে, আমাকে এ অকুল সমুদ্র হতে রক্ষা কর। স্বীয় পুত্র শিবনাথকেই বা কোথায় রেখে যাচ্ছ?" ঠাকুর বল্লভা দেবীর কথায় সন্তোষ্ট হয়ে বললেন, "তুমি শীঘ্রই মুক্তি লাভ করবে, এ বলে স্বীয়পুত্র শিবনাথকে আদেশ করলেন, "বৎস! অবগাহন করে এসো।" স্নানান্তে শিবনাথ উপস্থিত হওয়া মাত্র সর্ব্বানন্দ শিবপ্রদত্ত **সর্বসিদ্ধিমন্ত্র** তার কর্ণে প্রদান করেন এবং তাকে ভবযন্ত্রণা হতে উদ্ধার করলেন। শিবনাথ পিতাকে ভক্তি ভরে প্রণাম করে স্তব আরম্ভ করলেন-

ত্বমেকং নমামি ত্বমেকং স্মরামি,
ত্বমেকং পরং ব্রহ্মরূপং ভজামি।
নমস্তে পরং ব্রহ্ম চিদিম্ব কাশী।
নমস্তে পরং ব্রহ্ম রূপৈক ভাগী
নমস্তে কৃপাক্কো গুরুত্ব প্রকাশী!
নিরা কারায় নিত্যায় সগুনায়চিদাত্মনে।
সাধকা ভিষ্ট দানায় পাহিমাং ভবসাগরাৎ॥

ঠাকুর পুত্রের স্তবে তুষ্ট হয়ে বর প্রদান করলেন ঃ

১। গুরুরূপে কথিত মন্ত্ররূপ আত্মবিদ্যা একাদশ পুরুষ পর্যন্ত থাকবে।

২। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ভক্তি সহকারে মায়ের নামে রত থাকবে, নিশ্চয়ই তার হৃদয়াকাশে স্বয়ং ভগবতী বিরাজ করবেন।

৩। অনন্তর আত্মবিদ্যার লোপ হলে দ্বাবিংশতি পুরুষ হতে পুনরায় সে আত্মবিদ্যা প্রকাশিত হবে।

বরপ্রদান করে কুলনাথ সর্ব্বানন্দ স্বীয় শিষ্য রাজা জটাধরের বাড়ীতে এসে শ্রী শ্রী কালী মাতার মন্দিরে প্রবেশ করতঃ স্বীয় হস্তে খড়গ দ্বারা পাথরের ৺কালী মাতার মূর্ত্তির বক্ষে ভীষণ রূপে আঘাত করেন। এতে ক্ষতস্থান হতে অজস্র রক্তধারা প্রবাহিত হতে লাগল এবং তিনি সে স্থানে বসে বলে গিয়েছেন, **"যে ব্যক্তি এ মেহারে শ্রীশ্রী ৺কালী মাতার মূর্ত্তী স্থাপন করবে, তার অমঙ্গল হবে।"**

অতঃপর কুলনাথ সর্ব্বানন্দ সাধনসঙ্গী পূর্ণানন্দ ও ভাগিনা যড়ানন্দ সহ মেহার ত্যাগ করে যশোর জেলার সেনহাটি নামক স্থানে জ্যেষ্ঠতাত বানেশ্বর ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীতে কিছুকাল বাস করেন। সেনহাটিতে থাকাকালীন অবস্থায় সর্ব্বানন্দ ঠাকুর দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সেখানে তাঁর এক পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। নাম শিবানন্দ। সেনহাটিতে থাকাকালীন সময়ে ঠাকুর সর্ব্বানন্দ গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ

করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে সর্বোল্লাসতন্ত্র, ত্রিপুরার্চন দীপিকা, নবর্ণব পূজা পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য। কিছুদিন পর সর্ব্বানন্দ ঠাকুর পঞ্চাশ বৎসর বয়সে পূর্ণানন্দ ও ভাগিনা ষড়ানন্দসহ কাশীধাম গমন করেন।

কাশীতে মায়ের মহিমা প্রকাশ করবার জন্য বিরাচার ব্রত, মদ্যপান, মৎস্য-মাংসাদি ভোজন করে বাস করতে লাগলেন। কাশীতে তিনি গনেশ মহল্লায় প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সারদা মঠের মহন্তের গদী অলংকৃত করেন। ঠাকুর সর্ব্বানন্দ উক্ত মঠে প্রথম বাঙ্গালী মোহন্ত এবং আজও উক্ত মঠে বাঙ্গালী মোহন্তই বিদ্যমান আছে। এ মঠের প্রাণপুরুষ সর্ব্বানন্দ ঠাকুর। প্রতি বৎসর সিদ্ধ দিবস পৌষ সংক্রান্তিতে সেখানে অনুষ্ঠিত হয় সাড়ম্বর অনুষ্ঠান। এ মঠে সর্ব্বানন্দের **"পাদুকা যুগল"** আজও সযত্নে রক্ষিত আছে।

কাশীধাম থেকেও সর্ব্বানন্দ একদিন মহা-প্রস্থানের পথে পা বাড়ান। তাঁর গমন ও অবস্থান সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য জানা না থাকলেও কাশীর পরে এ মহা সাধকের পদধ্বনি শুনা গেছে হিমালয়ের তুষারাবৃত তীর্থ বদরীকাশ্রমে, ভূস্বর্গ কাশ্মীরে, চম্পকারণ্যে, চন্দ্রশেখর পর্ব্বতের সানুদেশে মহেন্দ্র ধারায়। মধ্য ও উত্তর ভারতে কোথাও কোথাও শুনা যায় তাঁর অবস্থানের কথা। কারও কারও মতে গঙ্গোত্রীর উপকণ্ঠে আজ প্রায় ৫০০ বৎসর যাবত তিনি যোগাসনে সমাসীন। বর্তমান জগতে এখনও বহুসাধক তাঁকে দর্শন করে নিজেকে পবিত্র ও ধন্য মনে করছে।

সর্ব্বানন্দ প্রণাম মন্ত্র

সমস্তভ্যং সর্ব্বানন্দং নমস্তে সাধকোত্তমম্
নমস্তে কুলনাথায় কুলকৌলিন্য দায়িনম্ ॥
মাতৃ কৃপা ধন্য পুরুষ প্রবরং।
দশমহাবিদ্যা প্রত্যক্ষ দক্ষিণম্।
মাতৃ শক্তাভাষ বিশ্বিত তন্ত্র রাজম।
নমস্তে মেহার তীর্থচন্দ্রং সিদ্ধ বরেণ্যম্।

মাতৃ প্রণাম-

ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণী নমোঽস্তুতে
সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনী
গুনাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে
শরণাগত দীনার্ত পরিত্রান পরায়নে


ওঁ
শ্রীশ্রীমেহার কালীবাড়ী
মহাসাধক
ঠাকুর সর্ব্বানন্দ দেবের
৺দশমহাবিদ্যা সিদ্ধপীঠস্থান